বিচিত্র পৃথিবী বিচিত্র ঘটনা

বরুণ মজুমদার



বিচিত্র পৃথিবী : বিচিত্র ঘটনা

৪৫০

বরুণ মজুমদার
(বেতার সাংবাদিক)

মণ্ডল এণ্ড সন্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৯৫

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

মূল্য : কুড়ি টাকা মাত্র।

মুদ্রক :
গীতা রাণী চ্যাটার্জী
প্রগতি প্রিণ্টার্স
৭৫, বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

ভূমিকা

বিচিত্র এই পৃথিবীতে কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটে থাকে। আমরা অনেকে এইসব অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার ও মজার ঘটনার কথা জানতে পারি না। জানলে অবাক বিস্ময়ে ভাবতে থাকি রূপ, রস, গন্ধে ভরা এই বসুন্ধরার কথা। এগুলো যেমন আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তোলে, তেমনি আবার আমাদের নতুন নতুন গবেষণায় অনুপ্রাণিত করে। একটা মিষ্টি হাতের ছোঁয়ায় কেমনভাবে এক গেলাস জল মিষ্টি হয়ে যায়, গোয়েন্দাগিরির কাজে শুয়োর আর মাছিরা কিভাবে সাহায্য করে, মানুষের পেটের রাক্ষুসে খিদে তাকে কেমন করে খড়, বিছানার চাদর পর্যন্ত খেতে সাহায্য করে, সাঁইত্রিশ বছর ধরে এক মহিলা কিভাবে অজ্ঞান হয়ে থাকতে পারেন, মাত্র একুশ দিন বয়সের শিশুকন্যার কিভাবে বিয়ে হয়, পঞ্চান্ন সন্তানের জননীর গর্বিত উক্তি, শিংওয়ালা জীবন্ত ফল কিভাবে পশুদের আক্রমণ করে, হাতিদের জন্য কোথায় স্কুল আছে, হ্যালির ধূমকেতু কিভাবে দেখা গেল—এ সব বিচিত্র কাহিনীর সন্ধান পেতে কে না আগ্রহী? এই আগ্রহের কথা মনে রেখে সাজিয়ে দিলাম বিচিত্র পৃথিবী : বিচিত্র ঘটনা। এতে আছে বিশ্ব রেকর্ডের বিচিত্র কাহিনী, মহাকাশ ইত্যাদি সম্পর্কে বিচিত্র সব অজানা তথ্য। বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই সম্ভবতঃ আর কেউ প্রকাশ করেননি। পাঠকদের ভাল লাগলে আমার পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করবো। এই বই প্রকাশে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন বন্ধুবর শংকর মণ্ডল। শ্রীজগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউষা ভৌমিক, সহকর্মী সত্যেন মিত্র ও শান্তনু পালধি আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের ছোট না করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

—বরুণ মজুমদার

১৪০, রামকৃষ্ণপুর লেন,
হাওড়া-২

সূচীপত্র

অত্যাশ্চর্য ঘটনা

মানুষ খেকো মানুষ ঃ

নরখাদক বাঘ, সিংহ বা কুমিরের কথা আমরা জানি। শুধু জানি না নরখাদক মানুষের কথা। রাক্ষস মানুষ খায় একথাও আমাদের শোনা। কাকের মাংস কাক খায় না—এরকম একটা প্রবাদ বহুদিন ধরে প্রচলিত আছে। তবে মানুষের মাংস মানুষ খায়—এটা আমাদের কারো পক্ষে বিশ্বাস করা সত্যিই দুষ্কর। অথচ এই ঘটনা নিয়ে এখন মধ্য আফ্রিকাতে রীতিমত তোলপাড় হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্য।

মধ্য আফ্রিকান সাম্রাজ্যের সম্রাট জঁা বেঙ্গেল বোকাসার তাঁর ব্রেকফাস্ট বা প্রাতরাশ সারতেন নাকি মানুষের রোস্ট দিয়ে। আমরা মুরগির রোস্টের কথা জানি। কিন্তু মানুষের রোস্ট এই প্রথম শুনলাম। আর এই চাঞ্চল্যকর তথ্যটা জানিয়েছেন বোকাসার তদানীন্তন রাঁধুনি ফিলিপ্পে লিঙ্গুইসা। ঐ রাঁধুনির বয়স এখন ৭০ বছর। দেহের একাংশ পক্ষাঘাতে পঙ্গু। কিন্তু বোকাসার রাঁধুনি হিসাবে কাজ করার সময় তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন আদালতে। তাঁর জবানবন্দি থেকে জানা যায় যে, সম্রাট বোকাসার তাঁকে একদিন মানুষের রোস্ট বানাতে বাধ্য করেন। তিনি প্রথমে রাজি হননি। কিন্তু সম্রাট নিজেই তাঁকে নিয়ে যান রান্নাঘরে। ফ্রিজ খুলে নিজেই বের করেন একটা মানুষের মৃতদেহ। তারপর সম্রাটের নির্দেশ—ঐ মানুষটাকে রোস্ট করে দিতে হবে তাঁর প্রাতরাশের খাবার টেবিলে। সেই নির্দেশ অমান্য করবে সাধ্য কার। তাই রাঁধুনি কোনরকমে ক্ষুরের সাহায্যে ঐ মৃতদেহের পেটের মধ্য থেকে নাড়িভুঁড়ি বের করে পরিষ্কার করে তার মধ্যে ভাত আর মদ পুরে বানিয়ে দিলেন সম্রাটের জন্য তোফা রোস্ট।

পোড়া মানুষের গন্ধে তাঁর গা গুলিয়ে উঠেছিল। আসলে রাঁধুনি সত্যিই হতভম্ব হয়েছিল সম্রাটরূপী মানুষের রাক্ষুসে কাণ্ডকারখানা দেখে। তার ওপর সম্রাট তাঁকেও ওই রোস্ট খেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা তিনি এড়াতে পেরেছিলেন। সম্রাট বোকাসা ১৯৭৯ সালে ফরাসি সেনাবাহিনীর হাতে পরাজিত হন।

মৌমাছিতে অঙ্গ ছাওয়া :

দস্যু রত্নাকর দীর্ঘদিন ধরে তপস্যা করেছিলেন। তাঁর গায়ে উইপোকার ঢিপি হয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁর নাম হয়েছিল বাল্মীকি। এ হল সেকালের রেকর্ড। একালে হয়েছে সারা গায়ে মৌমাছির ঝাঁক নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর রেকর্ড। কাজটা নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক। ম্যাক্স বেক এই দুর্লভ রেকর্ডের অধিকারী, তাঁর সারা শরীরে লেপ্টে আছে প্রায় ৭০ হাজার জ্যান্ত মৌমাছি। এ নিয়ে তিনি দিব্যি চলাফেরা করছেন। ম্যাক্সের পরনে আছে শার্ট, প্যান্ট, পায়ে জুতো। তার ওপরেই বসবাস করছে এই জ্যান্ত মৌমাছিগুলো। হাজার হাজার মৌমাছি তাঁর গায়ে লেগে থাকলেও একটা মৌমাছিও কিন্তু তাঁকে কামড়ায়নি। অনেকদিন ধরে এই পোষা মৌমাছিগুলোকে নিয়ে তিনি ঘুরছেন। তাঁর মাথাটাকেও ঢেকে আছে মৌমাছি। এমনকি নাক ও কানও ঢাকা পড়ে গেছে মৌমাছির ঝাঁকে।

চীনে রহস্যময় নদী :

চীনের 'পীত' নদীর কথা আমরা অনেকে জানি। সে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদীটার অস্বাভাবিক আচরণ নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখন রীতিমত গবেষণা চালাচ্ছেন। কয়েক বছর অন্তরই এই নদীটার মাঝখানটা হঠাৎ ফোঁড়ার মত ফুলে উঠছে। নদী থেকে পাঁচ মিটার

পর্যন্ত এই স্তূপ ফুলে উঠে থাকছে কয়েক ঘণ্টা, এমনকী কয়েকদিন পর্যন্ত। জমে উঠছে মাটি, বালি আর কাদার স্তূপ। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে আপনা আপনিই তা আবার নদীর বুকে মিলিয়ে যাচ্ছে। চীনের সাংক্সি প্রদেশের লংমেন থেকে টংউয়ান পর্যন্ত ১ শো ৩২ কিলোমিটারের কিছু বেশি জায়গা জুড়ে প্রতি পাঁচ বছর থেকে আট বছর অন্তর এই বিচিত্র ঘটনা ঘটছে। পীত পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি কর্দমাক্ত নদী। নদীটাতে যখন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে তখন সমগ্র নদীর কাদার শতকরা ৩৬ ভাগ অংশ এসে জমা হয় ঐ স্তুপে। আর ঐ সময় নদীতে কাদার স্রোত বয়ে যায়। বিশেষজ্ঞরা এখন এই রহস্যের কুলকিনারা করতে ব্যস্ত। এ ব্যাপারে তাঁরা এরই মধ্যে কিছু তথ্য জানতে পেরেছেন। তবে এ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তাঁরা তাঁদের গবেষণার ফল এখনই জানাতে চান না। তবে আপাতত বেশ কয়েক বছর ঐ নদীতে এ রকম ঘটনা আর ঘটেনি। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে সেখানকার বিশেষজ্ঞরা এই ধরনের বিচিত্র ঘটনা পাঁচবার ঘটতে দেখেছেন। হয়ত শীঘ্রই আবার এই ঘটনা ঘটবে। তাই তাঁরা শ্যেন দৃষ্টি রেখে চলেছেন নদীটার ঐ নির্দিষ্ট জায়গার ওপর।

রাক্ষুসে খিদে, আজব খাওয়া ঃ

সুকুমার রায়ের সেই 'খাই খাই' ছড়াগুলোর কথা হয়তো অনেকের মনে আছে—'খাই খাই কর কেন, এস বস আহারে,/ খাওয়ার আজব খাওয়া ভোজ কয় যাহারে।' এই আজব খাওয়ার কথা বাস্তবে হয়তো অনেকে শোনেননি। কিন্তু আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেই এমন একজন আছেন, যিনি খাবার জিনিস না হলেও হাতের কাছে যা পান তাই খান। খড়, কলাগাছ, কাঁঠালপাতা থেকে শুরু করে কাঁচা কুমড়ো, লাউ, ঝিঙে, আলু, কাঁচা লঙ্কা—সবই

আছে তাঁর খাদ্য তালিকায়। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে অল্পস্বল্প খেলে মোটেই তাঁর খিদে মেটে না। দিনে তিনি এই ধরনের খাবার ৮০ কেজি পর্যন্ত খেয়ে নিতে পারেন। হুগলির শেওড়াফুলির এই ভোজনবীরকে সেখানকার শুধু নয় আশপাশের জেলার অনেকেই এক ডাকে চেনেন। সবাই তাঁকে জানেন হাতি পাগল নামে। আসল নাম সুকুমার দাস। এত খাবার খেয়ে হজম করাটা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। আশপাশের কোন ক্লাবের সদস্যরা চাঁদা তুলে মাঝে মাঝে জনসমক্ষে তাঁর খাওয়ার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। তাতে রীতিমত ভিড় জমে যায়। কলাগাছ, খড় কুচি কুচি করে কেটে দিলে ও আস্ত কুমড়ো দিলে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। এসব তাঁর ভাল লাগে নাকি পোলাও কালিয়ার মতই। পেটে তাঁর প্রচণ্ড খিদে। তাঁর ভাষায়, 'খিদে পায় তাই খাই।' অনেকে হয়তো বলবেন, তাই বলে মশাই, ৮০ কেজি খাবার খাওয়া একটা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু না, আকৃতিতে তিনি কখনই রাক্ষসের মত নন। এমনকি অতি সাধারণ মানুষের মত। লম্বায় ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি আর চেহারাটা রোগাটে। তাহলে অত খাবার তাঁর পেটে ধরে কী করে? স্থানীয় লোকেদের ধারণা, লোকটা নিশ্চয়ই কোন মন্ত্রতন্ত্র জানে। তিনি কিন্তু এটা মোটেই মানতে রাজি নন। একবার এক প্রদর্শনীতে কাঁচ খেয়ে তিনি দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হল। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে নিয়ে বিপদে পড়লেন। অত খাবার কে তাঁকে যোগান দেবে? হাসপাতালে ভর্তি করার পরদিন সকালে দেখা গেল ক্ষুধার কবলে হাসপাতাল বেডের তোষক, চাদর, বালিশ সব উধাও! ওগুলো তাঁর পেটে চলে গেছে। পড়ে আছে লোহার খাটটা। সুকুমার দিব্যি হাসপাতালের মেঝেতে শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তখন অবস্থা—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি!

গোটা দশেক কলাগাছ, ২০ কেজি কুমড়ো, ৫ কেজি আলু, ৫ কেজি ঝিঙে, ৪ কেজি কাঁচা লঙ্কা, চিনির জলে ডোবানো ৫ কেজি খড় তিনি এক জায়গায় বসে অনায়াসে খেয়ে নিতে পারেন। সঙ্গে থাকে ১২টা পাতিলেবু। কিলো দুয়েক নুন আর এক ঝুড়ি কাঁঠাল-পাতা। আর এই কাঁঠাল পাতা তাঁর কাছে বেনারসি পান!

মানুষের ভক্ষ ইঁদুর, কুকুর, বেড়াল?

একটা কথা চালু আছে যে, 'খিদে পেলে বাঘে নাকি ধান খেতে দিশে পায় না।' বাঘে ধান খায় কি না, সে কথা আলাদা। ছাগলে কী না খায়, সে কথাও আলাদা। মানুষ খিদে পেলে কুকুর, বেড়াল এমনকি ইঁদুর পর্যন্ত ধরে ধরে খাচ্ছে—এমন দৃশ্য দেখলে মনে হবে, নিশ্চয়ই মানুষটার পেটে রাক্ষস ঢুকেছে। না, তাই বলে একজন-দুজন নয়, বেশ কয়েক হাজার লোক কিছুদিন ধরে ঐ ইঁদুর, বেড়াল, কুকুর খেয়ে দিন কাটিয়েছেন। অবশ্য তাঁরা এগুলি খেতে বাধ্য হয়েছেন। ব্যাপারটা কিন্তু আসলে খুবই করুণ। লেবাননের রাজধানী বেইরুট শহরের উপকণ্ঠে বুর্জ-এল-বারাজনের প্যালেস্তিনীয় শরণার্থী শিবিরে সিয়া মুসলিম মিলিসিয়ারা অবরোধ সৃষ্টি করে রেখেছিল পুরো প্রায় ৬ সপ্তাহ ধরে। ফলে সেখানে কোনো খাবারদাবার যেতে পারছিল না। অথচ ঐ শিবিরে থাকেন পুরুষ-নারী-শিশু মিলিয়ে ২৫ হাজার শরণার্থী। খাবার বন্ধ। তাই খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ঐ সব জন্তু ধরে ধরে তাঁরা নিজেদের উদর পূর্তি করেছেন। ১৯৮৭ সালের গোড়ার দিক থেকেই ঐ অবরুদ্ধ শিবিরে খাবার সরবরাহ বন্ধ ছিল। আসলে মানুষগুলোকে না খাইয়ে হত্যা করার জন্য এই অবরোধ। শেষ পর্যন্ত প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থার নেতা ইয়াসের আরাফত বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানালেন, মানুষগুলোকে বাঁচাতে। এগিয়ে এল রাষ্ট্রসংঘ। সিরীয় সেনাদের পর্যবেক্ষক দলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার

মধ্যে চাল, ময়দা আর দুধ বোঝাই তিনটি ট্রাক গিয়ে পৌঁছল ঐ শরণার্থী শিবিরে। মানুষগুলো তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ডাইনীর উপদ্রব :

ভূতুড়ে বাড়ির কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। ভূতের নানারকম আশ্চর্য আশ্চর্য কাণ্ডকারখানায় বাড়ির লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছেন, এরকম কথাও শোনা যায়। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, বাড়িতে এক চাপ রক্ত এসে পড়ল, বাড়ির ঘর থেকে জামাকাপড় উধাও হল এমন সব আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটার কাহিনী অনেকেই শুনে থাকবেন। এসব ভূতুড়ে বাড়ির কাণ্ডকারখানার কথা অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এমনি এক কাণ্ড ঘটেছে সাগর জেলার কল্যাণ গ্রামে। সেখানকার এক গ্রামবাসী জেলা ক্যালেক্টরের কাছে অভিযোগ করলেন তাঁর বাড়িতে ডাইনী লেগেছে। ডাইনীর উপদ্রবে তিনি অতিষ্ঠ। একের পর এক তাঁর পরিবারের আট জন ইতিমধ্যে মারা গেছে। ডাইনির উপদ্রবেই এটা ঘটেছে বলে তাঁর অভিযোগ। তাঁর কাতর আবেদন, অন্যত্র তাঁর জন্য একটা বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। সরকারি কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা তদন্তের আদেশ দিলেন। একজন কালেক্টর খোঁজখবর নিলেন। তদন্ত করে দেখা গেল ডায়েরির অভিযোগ সত্য। সুতরাং অন্য এক জায়গায় সরকারি খরচে তার জন্য একটা বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হল। এখন নতুন বাড়িতে উঠে গিয়ে তিনি অন্তত ডাইনীর কবল থেকে মুক্ত হয়েছেন।

দুঃসংবাদে মৃত্যু :

একই পরিবারের তিন ভাই একই দিনে পরপর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন—এমন ঘটনা বিরল। অথচ এই বিরল ঘটনা ঘটেছে পুরী শহরে। আসলে বড়ভাই প্রথম হৃদরোগে আক্রান্ত

হলেন এবং মারা গেলেন। এই মর্মান্তিক খবর শুনে মেজভাই হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন, তাঁকে গাড়ি করে পাঠানো হল হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছবার আগে পথে তাঁর মৃত্যু ঘটল। মাত্র আধ ঘণ্টার ব্যবধানে দুভাই মারা গেলেন। ব্যাপারটা খুবই মর্মান্তিক। আর এই দুঃসংবাদ যখন তৃতীয় ভাই-এর কানে গেল, তখন তিনি মনে এত আঘাত পেলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আক্রান্ত হলেন ঐ হৃদরোগে। পরপর দু ভাই-এর বিয়োগ সংবাদের দুঃখ তিনি সহ্য করবেন কী করে? গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত অবস্থায় তাঁকে ভর্তি করা হল হাসপাতালে। অবশ্য মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে তিনি বেঁচে আছেন। তবে ডাক্তাররা সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন, জ্ঞান ফিরে তিনি যদি আবার এই দুঃসংবাদের কথা মনে করে আঘাত পান তাহলে তাঁকে বাঁচানো যাবে না। সত্যি নিয়তির কি নির্মম পরিহাস!

মা মেরির আবির্ভাব :

মিশরের রাজধানী কায়রোতে একটা গির্জায় প্রতিদিন ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ছে। তাঁদের বিশ্বাস ঐ গির্জায় মা মেরি আর্তের সেবা করতে আসেন। কিন্তু মা মেরিকে কেউ কি স্বচক্ষে দেখেছেন? না, তবে অনেক ভক্ত বহুদিন ঐ গির্জায় হঠাৎ হঠাৎ আলোর ঝিলিক প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁদের ধারণা ঐ আলোর মাধ্যমেই মা মেরি গির্জায় আসেন। ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসের গোড়ার দিকে ঐ গির্জায় প্রথম আলোর ঝিলিক দেখা যায়। তখন অবশ্য এতে খুব বেশি আমল দেওয়া হয়নি। কিন্তু এরপর থেকে মাঝে মাঝেই ঐ আলোর ঝিলিক সকলকে রীতিমত অবাক করে দিয়েছে। আর মা মেরির আবির্ভাবের বিশ্বাসে আর্ত ও পীড়িত মানুষ ঐ গির্জায় এসে ভিড় করছেন। অনেকে নাকি গির্জায় এসে সুস্থ হয়ে বাড়ি

ফিরে গেছেন। যাঁরা ভাল হয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন ঐ গির্জায় তাঁদের নামের তালিকা রাখারও ব্যবস্থা হয়েছে। একবার গিয়ে দেখতে পারেন।

আশ্চর্য স্বপ্ন ঃ

কোন কালা ও বোবা লোক কোন রকম চিকিৎসা ছাড়াই আবার বাকশক্তি ও শ্রবণশক্তি ফিরে পেয়েছেন—কথাটা শুনলে কেউই হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবেন না। ভাববেন এটা স্রেফ বাজে কথা বা দিনদুপুরে স্বপ্ন দেখার ঘটনা। হ্যাঁ, এই স্বপ্নই কিন্তু লোকটাকে তার বাকশক্তি ও শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছে। অবশ্য স্বপ্ন ঐ ভদ্রলোকটিই দেখেছেন। আর দিনদুপুরে নয়, রাত্রে ঘুমিয়ে। যাকে নিয়ে এই আশ্চর্যজনক খবর, সেই ভদ্রলোকের নাম মেক্সিমেঙ্কো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে লড়াই করেছিলেন। সেই যুদ্ধের সময় চারদিকে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনতে শুনতে আর চারিদিকে যুদ্ধের বিভীষিকাময় দৃশ্য, রক্তপাত দেখতে দেখতে তিনি মূক ও বধির হয়ে গেলেন। কথা বলেন না, কানে শোনেন না—সুতরাং ফিরে এলেন নিজের পরিবারের কাছে। পরিবারের লোক তাঁকে পেয়ে নিশ্চয়ই খুশি হলেন কিন্তু তার বোবা কালা অবস্থা দেখে সবাই মুষড়ে পড়লেন। ডাক্তার দেখানো হল, অনেক ওষুধপত্র খাওয়ান হল, কিন্তু কিছুতেই তিনি তাঁর হারানো বাকশক্তি ও শ্রবণশক্তি ফিরে পেলেন না। এই অবস্থাতেই কাটল বেশ কয়েক বছর। আত্মীয় স্বজনেরা সব আশা ছেড়ে দিলেন। কিন্তু মেন্সিমেঙ্কোর জীবনে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল কিছুদিন আগে। একদিন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি। দেখছিলেন—প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে, কামান দাগা হচ্ছে গোলাগুলির শব্দ হচ্ছে, আহত সৈনিকরা আর্তনাদ করছে, অনেকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। এখানেই শেষ নয়, রক্তের বন্যা বহে

যাচ্ছে চারদিকে। মেক্সিমেঙ্কো ঘুমের মধ্যে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন—বন্ধ কর এই বীভৎস কাণ্ড। তাঁর চিৎকারে বাড়ির লোকজনের ঘুম ভেঙে গেল। সবাই অন্ধকারের মধ্যেই ছুটে এলেন তার বিছানার কাছে। সকলে বিস্ময়ে হতবাক—মেক্সিমেঙ্কো দিব্যি কথা বলছেন। এমনকি সকলের কথা তিনি শুনতেও পাচ্ছেন।

আশ্চর্য সন্ন্যাসী :

চীনে শাওলিন মন্দিরে সন্ন্যাসীদের দেড় হাজার বছর ধরে চোখের পাতা না ফেলে উপাসনা করতে এবং হাতের ঝাপটায় কাউকে বধ করার পদ্ধতি সম্পর্কে পারদর্শী করে তোলা হচ্ছে। তাঁরা ছায়া মুষ্টিযুদ্ধ, তরবারি খেলা ও শরীর নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির সমন্বয়ে গঠিত বিদ্যা শাওলিন কুং-ফুতে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। চীন ও এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এটা খুবই বিস্তার লাভ করেছে। মধ্যচীনের হেনান প্রদেশে পবিত্র সংশান পর্বতের পাদদেশে এইসব সন্ন্যাসীদের মঠ বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যাঁরা সঠিক উপায়ে আত্মরক্ষার জন্য শরীরকে শূন্যে ভাসিয়ে বা দ্রুত ঘুরিয়ে এই বিদ্যার গোপন পদ্ধতি শিখতে চান তাঁরা ঐ মঠ পরিদর্শনে যাবার জন্য উদগ্রীব। বছরে প্রায় ২০ লক্ষ পর্যটক সেখানে যান। এইসব পর্যটক সেখানে ঐসব সন্ন্যাসীদের নানা কসরত দেখতে যান। বৌদ্ধ মন্দিরের দেওয়ালগুলিতে একটা কথা লেখা আছে যে, শক্তির পদ্ধতির কোন শেষ নেই। সাধারণ পর্যটকদের কাছে এটা মনে হতে পারে যে, এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় নির্বাণলাভের একটা ভিন্ন পথ গ্রহণ করেছেন। সেখানকার মন্দিরগুলিতে ১৮ বছর থেকে ৮০ বছর বয়েসী একশো সন্ন্যাসী রয়েছেন। তাঁরা পাইন গাছের বনের মধ্যে বসবাস করেন এবং রৌদ্রে ঘুমোন। শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ওভারকোট গায়ে দেন।

হাত-কড়া পরে রেস্তোরাঁয় :

সেদিন সুইজ্যারল্যাণ্ডে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। হাত-কড়া পরা অবস্থার একটা লোক শহরের একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে চেয়ারে বসে খেতে লাগলো। দু হাতে হাত-কড়া পরা। সুতরাং হাত দিয়ে ছুরির সাহায্যে মাংসের টুকরো কেটে খাবার উপায় নেই। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো ঐ রেস্তোরাঁর এক পরিচারিকা। ঐ পরিচারিকা ছুরি দিয়ে মাংসের টুকরো কেটে দিল। আর হাত-কড়া পরা লোকটা কাঁটা চামচ করে তুলে তা খেতে লাগলো। সেখানকার অনেকেই এই বিচিত্র দৃশ্যটা দেখলো। কিন্তু কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করল না। খাওয়া শেষ করে লোকটা সেখান থেকে ঐ হাত-কড়া পরা অবস্থাতেই চলে গেল একটা জুতোর দোকানে। সেখানে দোকানের এক মহিলা তার পায়ে জুতো পরিয়ে দিলেন। নতুন জুতো পরে এরপর তিনি ঐ অবস্থায় সারা শহর ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কেউ কিন্তু তাকে কোনো প্রশ্ন করলেন না। কেন তার হাতে হাত-কড়া পরা, লোকটা পুলিশের হেফাজত থেকে পালিয়ে এসেছে কিনা—এ সম্পর্কে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই।

আসলে হাত-কড়া পরা ঐ লোকটা কোনো আসামী নয়, তিনি ছিলেন একজন সাংবাদিক। নাম জিয়ান লুই বার্নিয়ার। খবরের কাগজের ঐ রিপোর্টার ভদ্রলোক তাঁর এই অভিমতকে প্রমাণিত করতে চেয়েছিলেন যে, অধিকাংশ সুইস নাগরিক কোনো অপরাধী সম্পর্কে পুলিশে খবর দিতে অনিচ্ছুক। তাঁরা এ ব্যাপারে বিশেষ মাথা ঘামান না। তাঁর এই ধারণা যে ঠিক তা অবশ্য তাঁর ঐভাবে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। ঝাড়া সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে তিনি ঐভাবে শহরময় ঘুরে বেড়িয়েছেন 'ব্লিক' নামে একটি জার্মান ভাষার সংবাদপত্রে হাত-কড়া পরা অবস্থায় সাংবাদিক ভদ্রলোকের

জনবহুল রাজপথ দিয়ে হেঁটে যাবার ছবি প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য তাঁকে ঐ হাতকড়া পরিয়ে দেবার কাজে পুলিশের লোকেরা সাহায্য করেছিলেন। পুলিশদের অবশ্য ধারণা ছিল যে কুড়ি মিনিটের মধ্যে তিনি ফিরে আসবেন। শেষ পর্যন্ত একজন কামারের কাছে গিয়ে তিনি তাঁর হাত-কড়াটা কেটে দিতে বললে বিপত্তি ঘটলো। কামার তাঁর হাত-কড়া কেটে দিতে অস্বীকার করল। সাংবাদিক পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। নাছোড়বান্দা এই লোকটাকে অপরাধী ভেবে আর বিরক্ত হয়ে শেষে ঐ কামার পুলিশে খবর দিল।

মিষ্টি হাত ঃ

রাজা মিডাসের সোনার প্রতি প্রচণ্ড লোভ ছিল। তাই তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—তিনি যা কিছু স্পর্শ করবেন, তাই যেন সোনা হয়ে যায়। তাঁর সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছিল। তিনি যা কিছু স্পর্শ করেছেন, তাই সোনায় পরিণত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের ছোট্ট মেয়েকে আদর করে কোলে নিতে গেলেন। কিন্তু স্পর্শ করা মাত্র তার মেয়ে সোনার মূর্তিতে পরিণত হল। তখন তিনি তাঁর ভুলের জন্য অনুশোচনা করেছিলেন।

ইংরেজি গল্পে আমরা এ ব্যাপারটা পড়েছি। কিন্তু বাস্তবে এমন ঘটনার কথা আমরা শুনিনি। অথচ মহারাষ্ট্রের পুনেতে সত্যিই এ ধরণের বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। সেখানকার ভানুদাস গাইকোয়াড় নামে এক যুবক যা কিছু স্পর্শ করেন, তাই মিষ্টি হয়ে যায়। অবশ্য এর জন্য তিনি ভগবানের কাছে কোনো বর চাননি। শ্রীগাইকোয়াড় এক গেলাস জলে কয়েক সেকেণ্ড তাঁর আঙুল ডুবিয়ে রাখলেই তা মিষ্টি জলে পরিণত হয়। একটা ছোট্ট রুমাল বা পেনে কিছুক্ষণ হাত বোলালেই তা নাকি চিনির মত মিষ্টি হয়ে যায়। এটা রীতিমত তাজ্জব ব্যাপার। এর পেছনে কোনো যাদুবিদ্যা নেই। অন্তত ঐ

যুবক হলফ করে একথা বলেছেন। প্রথম প্রথম এটা লক্ষ্য করে ভানুদাস নিজেই রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। অনেকে বলেছেন যে তাঁর হয়ত বহুমূত্র রোগ হয়েছে। তাই তিনি নিজেই ডাক্তারের শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু ডাক্তাররা রক্ত পরীক্ষা করে জানালেন যে, তাঁর বহুমূত্র রোগ হয়নি, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। তবে কি এর পেছনে কোনো দৈবশক্তি কাজ করেছে? ভানু দাস নিজেও এর কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। হয়ত এই শক্তির বলে তিনি ম্যাজিক দেখিয়ে অনেক টাকা রোজগার করতে পারতেন। তা হলে তাঁর অভাবের সংসারে কিছু সুরাহা হত। কিন্তু না, তিনি ওভাবে পয়সা রোজগার করতে চান না। তিনি আর পাঁচজনের মত কায়িক পরিশ্রম করে পয়সা রোজগার করতে চান। তিনি নিজেই একথা জানিয়েছেন। তাঁকে নিয়ে পুনেতে এখন রীতিমত সোর-গোল পড়ে গেছে। বেচারা মিডাসের দশায় না পড়ে।

বিচিত্র ফুটবল :

আর্জেন্টিনায় ফুটবল খেলার নায়ক দিয়াগো মারাদোনাকে নিয়ে সারা পৃথিবীতে রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গেছে। প্রধানত তাঁরই কৃতিত্বের ফলে আর্জেন্টিনা দল এবার বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অথচ ফুটবলের এই নায়ককে যদি পশ্চিম জাভার এক গ্রামে গিয়ে সেখানকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ফুটবল খেলতে বলা হয়, তবে তিনি নিশ্চয়ই ইতস্তত করবেন। কেন না ঐ গ্রামে যুবকরা বিচিত্র এক প্রথা অনুযায়ী একটা জ্বলন্ত নারকেল নিয়ে খালি পায়ে ফুটবলে শট্ মারেন। আর খেলাটা হয় দিনের আলোতে নয়, রাত্রে। ফ্লাড লাইটে খেলা হয় না। খেলা হয় টর্চের আলোয়।

গোটা ঐ নারকেলটা দু সপ্তাহ ধরে কেরোসিনের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। তারপর একদিন রাত্রে তা কেরোসিন তেল থেকে তুলে এনে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। শুকনো ধানক্ষেতে সেই

আগুনের গোলটাকে ফেলে দিয়ে যুবকরা তা নিয়ে ফুটবল খেলেন। খালি পায়ে তাতে শট্ মারা হয়। পশ্চিম জাভার বারবাদ গ্রামের একটি মুসলীম বোর্ডিং স্কুলের সে সব ছাত্র সদ্য স্নাতক হয়েছেন, তাঁরা ঐ জ্বলন্ত নারকেলের গোলা নিয়ে 'ফুটবল' খেলতে ওস্তাদ। এইভাবে তাঁরা নিজেদের শক্তি আর আহত হবার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতার পরিচয় দেন। দুশো বছর আগে প্রতিষ্ঠিত ঐ স্কুলে এই বিচিত্র প্রথা চলে আসছে নিরবছিন্নভাবে।

বৃষ্টির জন্য বন্ধ্ :

কোন ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাতে বা বিশেষ কোন দাবিতে আমরা বন্ধ ডাকার কথা শুনে থাকি এবং সেইসব দাবিও প্রতিবাদের ভিত্তিতে বন্ধ্ পালিত হয়। গুজরাটের ভায়াভাদুর শহরে কিছুদিন আগে এক বিচিত্র বন্ধ্ ডাকা হয়েছিল। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানানোর জন্য কিন্তু এই বন্ধ্ পালন করা হয়নি। এই বন্ধ্ ডাকা ও পালন করা হয়েছিল বৃষ্টির দেবতার উদ্দেশে বিক্ষোভ জানানোর জন্য। ১৯৮৭ সালের জুলাই মাসের একটা দিন ঐভাবে স্থানীয় লোকেরা বন্ধ্ পালন করেছেন। খরায় সেখানে সমস্ত এলাকা তখন জ্বলছিল। বৃষ্টি নেই, জল নেই, কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে জমি ফেটে চৌচির। তাই সেখানকার মানুষজন বন্ধ্ ডেকে তাঁদের ভাষায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

টেলিফোনের জন্য মৃত্যু :

টেলিফোনের জন্য আবেদন করে মাসের পর মাস বছরের পর বছর অপেক্ষা করে থাকার ঘটনা শুধু আমাদের দেশেই ঘটে না অন্যান্য দেশেও ঘটে। এই টেলিফোনের জন্য কোন মানুষের মৃত্যুর ঘটনা সত্যিই মর্মান্তিক! আর এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে মিশরের

কাইরো শহরে। সেখানকার এক যুবক অ্যাডেল মুস্তাফা। টেলিফোনের জন্য আবেদপত্র জমা দিলেন কর্তৃপক্ষের কাছে। বাড়িতে ফোন আসবে, সকলের সঙ্গে কথা বলবেন এটাই ছিল তাঁর একমাত্র শখ। কিন্তু দেখতে দেখতে ১৫টা বছর কেটে গেল। মনের আশা তিনি মনেই লালন করতে লাগলেন। তবুও তাঁর স্থির বিশ্বাস একদিন বাড়িতে টেলিফোন আসবেই। ক্রমে তাঁর বয়স বাড়লো। একদিন মুস্তাফা হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন। ডাক্তাররা চিকিৎসা করে তাঁকে সুস্থ করে তুললেন। তিনি আবার হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন। তখনো তাঁর আশা বাড়িতে ফোন আসবে। এক দিন সত্যি সত্যিই এল অবশ্য ফোন নয়, বাড়িতে ফোন বসাবার অনুমতি জ্ঞাপক পত্র। তাহলে মুস্তাফার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। আর সেই ফোন আসার অত্যধিক আনন্দে বেচারা মুস্তাফা হৃদরোগে আবার আক্রান্ত হলেন। আর তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটলো। তিনি বাড়িতে ফোন বসানো দেখে যেতে পারলেন না, বা কারো সঙ্গে ফোনে কথা বলতেও পারলেন না।

বিমানে আগুনের গোলা :

সোভিয়েত ইউনিয়নে আকাশ পথে একটা বিমান উড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ বাজ পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা আগুনের গোলা বিমানটার ধাতুর তৈরি দেওয়াল ভেদ করে ককপিটের কাছ দিয়ে ঢুকে পড়ল বিমানের মধ্যে। আস্তে আস্তে সেই আগুনের গোলাটা যাত্রীদের মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে বিমানের পেছন দিক ভেদ করে বেরিয়ে গেল। বিমানের সমস্ত যাত্রী অবাক বিস্ময়ে ঘটনাটা দেখলেন। কৃষ্ণসাগর উপকূলের সোচি বিমানবন্দর থেকে যাত্রীদের নিয়ে বিমানটা তখন সবে চল্লিশ কিলোমিটার পথ গেছে। সেই সময়েই ঐ বিপত্তি। ইলিউসিন-১৮ নামে ক্ষতিগ্রস্ত এ বিমানটিকে চালক নিরাপদে অবতরণ করিয়েছেন। বিমানযাত্রী বা বিমান-

কর্মীদের কেউই এই ঘটনায় আহত হননি। সোভিয়েত সংবাদ সংস্থা 'তাস' এই খবর জানিয়েছে।

জেল প্রীতি :

কেউ কোন অপরাধ করে জেলে গেলে, তার লক্ষ্য হয় কবে সে জেল থেকে ছাড়া পাবে। কিন্তু এমন মানুষও আছে যে বছরের পর বছর জেলে থাকতে ভালবাসে। এদের বলা হয় জেল ঘুঘু। জাপানে ৬৬ বছর বয়স্ক একটা লোক মোট ২৯ বছর জেল খেটেছে। একবার ছাড়া পেয়ে বাইরের শুদ্ধ জীবন তার ভাল লাগল না। আবার দীর্ঘকাল তাকে কারাগারে পাঠানো হবে—এই আশায় সে একটা চালের গুদামে আগুন ধরিয়ে দিল। সে ধরা পড়ে পুলিশকে জানায় যে, তার হাতে মোটেই টাকা পয়সা নেই। তাই সে আবার জেলে যেতে চায়।

মৃত্যুর ষাট বছর পর পেনসন :

কোন কর্মী মারা যাওয়ার ৬০ বছর পর তাঁর পত্নী পেনসন পেয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত সচরাচর পাওয়া যায় না। মাদ্রাজ পুলিশ এ ব্যাপারে সত্যি সত্যি রেকর্ড করেছে। মাদ্রাজ পুলিশ বিভাগে কর্মরত সাব ইন্সপেক্টর কৃষ্ণান নায়ার ১৯২৪ সালে মারা যান। দীর্ঘ ৬০ বছর পরে তাঁর পত্নী লক্ষ্মী কুট্টিকে মাদ্রাজ পুলিশ বিভাগ পেনসন মঞ্জুর করেছে। বৃদ্ধা লক্ষ্মীদেবী এখন কেরালায়। ১৯৭৯ সালে মাদ্রাজ সরকার পেনসন চালু করলে লক্ষ্মীদেবীও পেনসনের জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু পুলিশ বিভাগ থেকে তিনি বিশেষ সাড়া পেলেন না। অনেকদিন পরে তাঁর কাছে চিঠি এল—তাঁর মৃত স্বামীর নামে কোন রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং তিনি পেনসন পাবেন না। লক্ষ্মীদেবী পেনসনের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল। স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় তাঁর স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তিনি সেই সংবাদপত্রের কপি যোগাড় করলেন। জমা দিলেন পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে। আর তারই ভিত্তিতে পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাঁর জন্য ১৫ হাজার টাকা পেনসন মঞ্জুর করেছেন।

কোটিপতির আত্মহত্যা :

নিজের চেষ্টাতেই কোটিপতি হয়েছেন এমন এক পাগলাটে লোক পাঁচ-পাঁচবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত তিনি নগদ ৪০ হাজার ডলার ও ৬০ হাজার ডলার মূল্যের একটি মোটর গাড়ির বিনিময়ে একজন কর্মচারীকে তাঁকে হত্যা করতে রাজী করান। ভদ্রলোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির বাসিন্দা। সরকার পক্ষের সহকারী উকিল বলেছেন যে, ঐ কর্মচারীটিকে সরাসরি হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়নি, তাঁকে দ্বিতীয় পর্যায়ের মানুষ বলির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কারণ, তদন্ত করে দেখা গেছে যে, ঐ কোটিপতি ভদ্রলোক নিজেই মরতে চেয়েছিলেন। জুলিয়াস বিটম্যান নামে ৪৪ বছর বয়স্ক ঐ কোটিপতি ভদ্রলোক হাঙ্গেরি থেকে সেখানে এসে বসবাস করছিলেন। ১৯৮৭ সালের ২৫শে নভেম্বর ২৫ বছর বয়স্ক ফ্রেডরিক উইসনেস্কি নামে একজন কর্মচারী তাঁকে গুলি করে হত্যা করেন। ঐ কর্মচারীটি ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁকে পরে ৫০ হাজার ডলার জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। বিটম্যান তাঁর এবং ঐ কর্মচারীটির মধ্যে সমস্ত কথাবার্তা টেপ করে রেখেছিলেন। কর্মচারীটি তাঁর নিউ জার্সির দোকানে কাজ করতেন। তিনি বলেছিলেন যে তাঁকে হত্যা করা না হলে ঐ কর্মচারীটিকে তিনি জালিয়াতির অভিযোগে বরখাস্ত করবেন।

নাম নিয়ে বিভ্রাট :

সামান্য নাম নিয়ে যে কী বিভ্রাট! বাবা-মা ছেলে-মেয়েদের আদর করে কত সুন্দর সুন্দর নামই না দিয়ে থাকেন। ছেলের নাম রাজা বা মেয়ের নাম রানী অনেকেই দিচ্ছেন। এতে আর এমন কী বিভ্রাট ঘটতে পারে? স্কটল্যাণ্ডের আইল অব স্কিতে পিতা-মাতা এক নবজাত শিশুকন্যার নাম রাখলেন প্রিন্সেস ডুলসিমা রোজেত্তা। নিয়ম অনুযায়ী তার পিতা সরকারি রেজিস্ট্রি খাতায় নাম নথিভুক্ত করালেন। সেইমত বার্থ সার্টিফিকেটও তৈরি হল। সার্টিফিকেটটা কর্তৃপক্ষ তুলে দেবেন কন্যার পিতার হাতে। কিন্তু হঠাৎ কর্তৃপক্ষের একজনের নজর পড়ল নামের প্রথমে প্রিন্সেস অর্থাৎ রাজকুমারী শব্দটার ওপর। কী করবেন তিনি, কিছুতেই ভেবে পেলেন না। অতঃপর তা পাঠিয়ে দিলেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। ওপর মহল থেকে জরুরি পত্র পাঠিয়ে তলব করা হল শিশুকন্যার পিতাকে। চিঠি পেয়ে তো ভদ্রলোক বেশ বিচলিত বোধ করলেন। বার্থ সার্টিফিকেট দেবার বদলে হঠাৎ কেন জরুরি তলব? দুরু দুরু বক্ষে গেলেন দেখা করতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। তাঁকে বলা হল, 'আপনার বাড়িতে আদর করে কন্যাকে যত খুশি 'প্রিন্সেস' বলে ডাকুন তাতে আমাদের কারো আপত্তি নেই। কিন্তু সরকারি নথিতে ঐ শব্দটা লেখা যাবে না। রাজ পরিবারের মেয়েরাই শুধু ঐ নামে অভিহিত হতে পারবেন।' ব্যর্থ মনোরথ হয়ে শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক তাঁর কন্যার নামের আগে প্রিন্সেস শব্দটা বাদ দিয়েই নথিভুক্ত করালেন।

পেটের ভেতর বোমা :

'পেটে বোমা মারলে ক বেরোয় না'—এমন একটা প্রবাদ চালু আছে। বলা বাহুল্য, মূর্খদের সম্পর্কে এই কথাটা প্রচলিত। কিন্তু

কোনো মানুষের পেটের মধ্যে বোমা আছে—এমন কথাটা শুনলে আশ্চর্য হবারই কথা। আর এই আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে বাগদাদে। সেখানে যুদ্ধে আহত এক সৈনিক যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। ডাক্তাররা তাঁর পেটের এক্স-রে করলেন। অবাক কাণ্ড! ঐ আহত সৈনিকের পেটের মধ্যে বোমার মত একটা জিনিসের অস্তিত্ব ধরা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে শল্যচিকিৎসকের দল অস্ত্রোপচার করলেন তাঁর পেটে। অবশ্য ঐ সৈনিকের পেটের কিছু অংশ ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। রক্তও ঝরছিল। অস্ত্রোপচার করে রকেটযুক্ত একটা গ্রেনেড বা হাতবোমা দেখে ডাক্তাররা রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। ডাক পড়ল বোমা বিশেষজ্ঞদের। বিশেষজ্ঞরা পেটের ভেতরে থাকা অবস্থায় ঐ বোমাটিকে নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করেও সফল হলেন না। ভার পড়ল চিকিৎসকদের ওপর। তাঁরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অস্ত্রোপচার করে তাজা অবস্থায় বোমাটিকে পেটের মধ্য থেকে বের করে আনলেন। তারপরই বোমা বিশেষজ্ঞরা সেটিকে নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম হলেন। আহত সৈনিকটি এরপর ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করেছেন। পেটের ভেতর বোমার অস্তিত্ব অনেককেই অবাক করে দিয়েছে। অনেকের ধারণা, শত্রুপক্ষের ছোঁড়া ঐ বোমাটি হয়তো না ফেটে কোনো রকমে সৈন্যটির পেটের মধ্যে তাজা অবস্থায় ঢুকে গেছে।

এ যুগে সমুদ্র মন্থন :

দেবতারা সমুদ্র মন্থন করে অমৃত পেয়েছিলেন। আর সেই অমৃত পান করে দেবতারা অমর হয়েছেন। দানবকুল সেই অমৃত সুধা পান থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। পুরাণ থেকে আমরা এই ঘটনার কথা জানতে পারি। পুরাণের কথা ছেড়ে এবার অন্য কথায় আসি। সাগর থেকে মুক্তা আনার কথাও শোনা যায়। পুণ্যার্থীরা সাত সাগরের জল মাথায় দিয়ে পুণ্য অর্জন করে থাকেন।

আধুনিক যুগে সেই সমুদ্র মন্থনের কথা অজানাদের অনেকেরই জানা নেই। সমুদ্র মন্থন করে বিজ্ঞানীরা তার তলা থেকে সংগ্রহ করে আনছেন অমৃতস্বরূপ অনেক জীবনদায়ী ওষুধ। বিজ্ঞানীরা এখন এই দুরূহ কাজে হাত দিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে এই কাজে যুক্ত রয়েছেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা।

ক্যারিবিয়ান সাগরে বিজ্ঞানীরা এক ধরনের স্পঞ্জ পেয়েছেন। নতুন ধরনের এই স্পঞ্জ থেকে তৈরী হয়েছে অ্যাবাসি নামে একটা ওষুধ। এই ওষুধ কয়েক ধরনের ক্যান্সার রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন।

ভূমধ্যসাগরে সন্ধান মিলেছে এক ধরনের ছত্রাকের। এই ছত্রাক থেকে তৈরী হয়েছে সেকালের স্পেরীন নামে একটা ওষুধ। পেনিসিলিনের সমগোত্রীয় এই ওষুধ খুবই কার্যকরী বলে পরীক্ষা করে জানা গেছে। ভবিষ্যতে হয়ত এই জাতীয় ওষুধ ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হবে। তবে ভয় নেই, শুধুমাত্র দেবতাদের মত কোনো একটা বিশেষ দেশে আধুনিক যুগের এই অমৃত একা ভোগ করবেন না। আপনি আমি সকলেই হয়ত এর সুফল ভোগ করবো। তাই বলে আপনাদের কিন্তু দানবকুলের মধ্যে ফেলছি না। আবার দেবকুলের মধ্যেও ফেলছি না। আবার বলছি না—'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'। আমরা সবাই মানুষ। যাক যে কথা বলছিলাম তাতেই ফিরে আসি। জাপান সাগর মন্থন করে বিজ্ঞানীরা তার তলদেশ থেকে পেয়েছে কীটনাশক সামগ্রী তৈরির মালমশলা। এ থেকে তৈরী হয়েছে প্যাচান নামে কীটনাশক। এই কীটনাশক মানুষ বা অন্য জন্তুর কোনো ক্ষতি করে না।

মানুষের কীর্তি কাহিনী

অন্ধ পরিচারিকা ঃ

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শহর হুনুলুলুতে একটা ব্যস্ত রেস্তোরাঁয় শেরি নেলসন নামে ২৮ বছর বয়স্কা এক মহিলা পরিচারিকার কাজ করছেন। তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ। তাঁর এই দৃষ্টিহীনতা তাঁর কাছে মোটেই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তিনি টেবিলে বসে খদ্দেরদের সমস্ত অর্ডার মনে রেখে সেই অনুযায়ী চটপট টেবিলে খাদ্য সরবরাহ করছেন। তিনি এতই চটপট কাজ করে থাকেন যে অনেক খদ্দের বুঝতেই পারেন না তিনি একজন প্রতিবন্ধী। তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে র‍্যাডার নেলসন। কারণ চোখে না দেখতে পেলেও তিনি বুঝতে পারেন কখন তাঁর খদ্দেররা খাবার শেষ করে ফেলেছেন, অথবা কোন খদ্দেরের জলের গ্লাসে জল ফুরিয়ে গেছে।

মুর্খ দিবস ঃ

আপনারা কেউ কি নিজেকে মূর্খ বলে জাহির করে গর্ব অনুভব করবেন ? নিশ্চয়ই নয়। হয়তো যাঁরা নিজেদের মূর্খ বলে প্রতিপন্ন করতে চান, এটাকে তাঁদের মূর্খতার পরিচয় বলে অনেকে মনে মনে হাসবেন। অথচ এমন লোকও আছেন যাঁরা নিজেদের মূর্খ বলে পরিচয় দিয়ে গর্ব অনুভব করেন। তা না হলে মূর্খ মহা-সম্মেলন হবে কেন ? আমাদের ভারতেই এই সম্মেলন হয়ে গেছে। খোদ রাজধানী নতুন দিল্লিতেই ১৯৮৭-র মার্চ মাসে হোলি উৎসব পালনের দিন পালিতও হয়েছিল তথাকথিত মূর্খ দিবস। আন্তঃরাষ্ট্রীয় মূর্খ মহা-সম্মেলনের উদ্যোগে পালিত হয়েছে এই মূর্খ দিবস। বেশ কিছু তথাকথিত মূর্খ সগর্বে সেদিন দিল্লির বিভিন্ন

সড়কে বের করলেন বর্ণাঢ্য মিছিল। মিছিল নানান পথ পরিক্রমা করে। তারপর তাঁরা মিলিত হন এক সম্মেলনে। ঐ সম্মেলনে মূর্খদের সমস্যার কথা নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা হয়েছে; তবে লেখাপড়া শিখে তাঁরা ভালভাবে উন্নত জীবনযাপনের অঙ্গীকার করেছেন কিনা জানা যায়নি। মহাকবি কালিদাস প্রথম জীবনে অতি মূর্খ ছিলেন, একথা বই পড়ে জানা গেছে। তিনি একটা গাছের ডালে বসে সেই ডালই কাটছিলেন। এক পণ্ডিত ব্যক্তি নাকি এই দৃশ্য দেখে তাঁর মূর্খতার পরিচয় পেয়ে অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু কালিদাস নিজেকে মহামূর্খ বলে জাহির করতে এগিয়ে আসেননি। তারপর সরস্বতীর বরে মূর্খ কালিদাস মহাপণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন, সে কথাও আমরা জানি। কিন্তু তথাকথিত মূর্খরা কারো বরে পণ্ডিত হয়ে উঠবেন, এমন ইঙ্গিত এখনো পাওয়া যায়নি।

অন্ধদের যাদুঘর :

যাদুঘরে অনেক পুরনো এবং আশ্চর্যজনক জিনিসপত্র দেখে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি, আনন্দলাভ করি। দুচোখ মেলে আমরা এইসব সামগ্রী দেখি। দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা তো এসব জিনিসপত্র দেখতে পান না। তাঁদের দুঃখ কিছুটা পুষিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্ধদের জন্য যাদুঘর! ব্যাপারটা শুনলে নিশ্চয়ই দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা খুশি হবেন। এমন ধরনের একটা যাদুঘর গড়ে উঠেছে বোম্বাইতে। এটি গড়ে তুলেছেন লুই ব্রেইল স্মৃতি গবেষণা কেন্দ্র। সেখানে রাখা হয়েছে নানান রকমের মানচিত্র, বই ও পোস্টকার্ড। এছাড়া আছে অন্যান্য নানান ধরনের সামগ্রী। স্পর্শ অনুভূতির সাহায্যে উপলব্ধি করা যায়, এরকম ব্যবস্থা করেই এইসব সামগ্রী সেখানে রাখা হয়েছে। ব্রেইল পদ্ধতির লেখাও রাখা আছে ঐ বিচিত্র ধরনের যাদুঘরে।

সমুদ্রের তলায় রেল স্টেশন ঃ

মাটির তলায় অর্থাৎ ভূগর্ভে রেলপথে স্টেশন থাকে তাতে ট্রেন থামে, যাত্রীরা ওঠা-নামা করেন। কিন্তু সমুদ্রের তলায় কোন রেল স্টেশনের কথা শুনলে কিছুটা অবাক হতে হয় বৈকী! এক বছর দুবছর নয়, দীর্ঘ ২৪ বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় জাপানে সমুদ্রের তলায় পৃথিবীর প্রথম রেল স্টেশন গড়ে উঠেছে। সেখানে সমুদ্রের তলদেশে সুড়ঙ্গপথে রেল চলাচলের ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৮৮ সালের মার্চ মাস থেকে ৫৩.৮ কিলোমিটার সুড়ঙ্গপথে এই ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা হয়েছে। দীর্ঘ পথে যাত্রীদের একনাগাড়ে বসে থাকতে হবে না। ট্রেন যাত্রার একঘেয়েমি কাটানোর জন্য যাত্রীরা যে কেউ ইচ্ছে করলে সমুদ্রের তলায় রেল স্টেশনে নেমে কিছুটা পায়চারি করে নিতে পারবেন। না না, তাই বলে ঐ স্টেশনে নেমে সারারাত সেখানে বসে থাকতে হবে না। কিছু পরেই থাকবে আরও ট্রেন। বাকি পথটুকু যাত্রীরা পরবর্তী ট্রেনে করে পাড়ি দেবেন। ভয়ের কোন কারণ নেই। স্টেশনে নামলে মনেই হবে না যে, আপনারা কেউ সমুদ্রের তলায় আছেন। এই সুড়ঙ্গ-রেল পথের মাধ্যমে জাপানের হোক্কাইডো দ্বীপ ও হনসু দ্বীপের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এই বিস্ময়কর রেলপথের পরিকল্পনা নিয়েছে জাপানের হোক্কাইডো রেল কোম্পানি। ব্যাপারটা ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়।

শতবর্ষে স্বীকৃতি ঃ

উত্তরপ্রদেশের উন্নাও জেলার এক বৃদ্ধা শেষ পর্যন্ত তাঁর কাজের স্বীকৃতি পেলেন। আজ থেকে একশো বছর আগে কানপুর ও উন্নাও-এর মধ্যে পুরনো গঙ্গা সড়ক সেতু নির্মাণে তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। কিছুদিন আগে একশো তিরিশ বছর

বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি যে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন তার স্বীকৃতি জানাতে তাঁর মরদেহ নিয়ে ঐ সেতু থেকে শোকমিছিল বের হয়।

ক্ষণজন্মা শিশু শিল্পী ঃ

মাত্র সাত বছর বয়সের একটা শিশু। এই বয়সের মধ্যে সে ২০ হাজার ছবি এঁকে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। তার আঁকা ছবির মধ্যে আছে জলরঙ ও তৈলচিত্র। এই শিশুশিল্পীর তুলির টান দেখে বড় বড় শিল্পীরা রীতিমত অবাক। তার ছবির বিষয়বস্তু হল—ঈশ্বর, প্রকৃতি, শোক-দুঃখ প্রভৃতি। কিন্তু এই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী শিশুটাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়ত ঈশ্বরের অভিপ্রেত ছিল না। মাত্র ৭ বছর বয়েসেই তার মৃত্যু ঘটলো। তার বয়স যখন দু বছর, তখন থেকেই এডমণ্ড টমাস ক্লিণ্ট নামে কেরালার এই শিশুটা ছবি আঁকা শুরু করে। এর এক বছর পর, অর্থাৎ তিন বছর বয়সে সে আক্রান্ত হল মারাত্মক ধরনের কিডনির অসুখে। কিন্তু এডমণ্ড কিছুতেই দমবার পাত্র ছিল না। অসুস্থ শরীর নিয়েই সে তার ছবি আঁকার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো। এতদিন সে জলরঙে ছবি আঁকছিল, ছ' বছর বয়স থেকে তেল রঙের ছবি আঁকা শুরু করলো। তার তুলির টানে ফুটে উঠলো একজন জাত শিল্পীর ছবি। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে মাত্র ৭ বছর বয়সেই তার মৃত্যু ঘটলো। দেখতে দেখতে তিনটে বছর কেটে গেল। এবার তাকে নতুন করে স্মরণ করা হল কেরালায় তার আঁকা কিছু নির্বাচিত ছবির এক প্রদর্শনীর মাধ্যমে। গত ৩রা আগস্ট চারদিন ব্যাপী ঐ চিত্রশিল্প প্রদর্শনী শুরু হয়েছিল। দর্শকরা সেই ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। ত্রিবাঙ্কুর স্টেট ব্যাঙ্ক এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। তার আঁকা 'ত্রিচূড় পূরম' ছবিটা কেরলা উৎসবে রাজ্য পর্যায়ের পুরস্কার পায়।

বেকারদের অভিনব ভিক্ষা ঃ

ভিখারিরা ভিক্ষা করে, কেউ ভিক্ষা করে চাল ডাল, আবার কেউ চায় পয়সা। ট্রামে বাসে বা ট্রেনে ভিখারিরা পয়সা ভিক্ষা করছে এমন দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে। অনেকে আবার কোন কাজ না পেয়ে ভিক্ষাকেই বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। ভিক্ষা করে অনেকে প্রচুর টাকা পয়সা জমিয়েছে এরকম ঘটনার কথাও আমাদের অনেকের জানা।

রাজস্থানে কিন্তু এক ধরনের ভিখারির সন্ধান পাওয়া গেছে যাঁরা খাবার বা টাকা পয়সা ভিক্ষা করছেন না। তাঁরা সবাই কিন্তু শিক্ষিত বেকার। লেখাপড়া শিখেও তাঁরা চাকরি পাচ্ছেন না। তাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁরা ভিক্ষা করছেন চাকরি। বাড়ির কর্তাকে দেখলেই তাঁরা বলছেন, দয়া করে একটা চাকরি দিন। এতে অনেকেই রীতিমত অবাক হচ্ছেন। দয়াপরবশ হয়ে বেকার যুবকদের কাউকে কেউ চাকরি করে দিয়েছেন, এমন কথা শোনা যায়নি। তবুও ঐসব যুবক কিন্তু হতাশ হননি। আর হতাশ না হবারই কথা। কেননা তাঁরা জানেন যে এই বাজারে কেউই দয়া করে তাঁদের কাউকে কোন জায়গায় চাকরি করে দেবে না। তবুও তাঁরা অভিনব এই ভিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন কেন? ওঁদেরই মধ্যে এক বেকার যুবক জানিয়েছেন যে, তাঁদের মত দেশের অন্যান্য শিক্ষিত বেকার যুবকদের সমস্যা সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

পিওনের কীর্তি ঃ

রোজ একঘেয়ে কাজ করতে করতে ঔরঙ্গাবাদের এক পিওনের বিরক্তি ধরে গেল। রোজই ডাকঘর থেকে চিঠি নিয়ে তা বাড়ি বাড়ি বিলি করা কাঁহাতক ভাল লাগে। ঐ পিওন ভদ্রলোক একদিন

ডাক বিলি করার নামে চিঠিপত্র নিয়ে বেরোলেন। কিছুদূর গিয়েই তাঁর আর ভাল লাগল না। ভাবলেন, কেউ তো আর দেখছে না যে চিঠি ঠিকমত বিলি হচ্ছে কিনা, তাই বাণ্ডিল শুদ্ধ চিঠিপত্র সবার অলক্ষে ফেলে দিলেন একটা পুকুরে। কিছুক্ষণ পরে এক ভদ্রলোক ঐ অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, পুকুরে শয়ে শয়ে চিঠি ভাসছে! সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাছাকাছি ডাকঘরে গিয়ে ব্যাপারটা জানালেন। পুলিশে খবর গেল। পুলিশ এসে ব্যাপারটা দেখলেন। উদ্ধার করা হল পুকুরে ভাসমান চিঠিগুলো। সংশ্লিষ্ট পিওনকে গ্রেফতার করা হল। জিজ্ঞাসাবাদের সময়, ঐ পিওন জানিয়েছেন—শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল, যে, তিনি এক পাও হাঁটতে পারবেন না। অগত্যা চিঠিগুলো তিনি ঐ পুকুরে ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্যে ডাক কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ মোটেই সন্তুষ্ট নন। পিওন বাবাজী এখন শ্রীঘরে। ডাক কর্তৃপক্ষ অবশ্য ঐ পুকুরের জল থেকে উদ্ধার করা ২৮০টা চিঠির মধ্যে ২৪১টার ঠিকানা ঠিকমত পড়তে পেরে তা সংশ্লিষ্ট প্রাপকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

কাগজের নোটে ঘর সাজানো :

বাড়িতে ঘরের দেওয়ালে টাকা সেটে রাখার কথা আমরা অনেকে ভাবতে পারি না। কেউ যদি আঠা দিয়ে দেওয়ালে টাকা সেটে ঘর সাজান, তবে নিশ্চয়ই আমরা তাঁকে পাগল ভাবব বা ভাবব লোকটা প্রচুর টাকার মালিক। অথচ লেবাননে সত্যিই এ ধরনের অবাক করা কাণ্ড ঘটেছে। সেখানে অনেকেই সাধারণত ছবি আঁকা রঙ বেরঙের বাহারি কাগজ দেওয়ালে সেঁটে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। কিন্তু এসব বাহারি কাগজের দাম এখন এত বেড়ে গেছে যে, সুহেইল কারৌনি নামে এক সাধারণ অধিবাসী

ওয়ালপেপারের পরিবর্তে সে দেশের কাগজের নোটগুলো ঘরের দেওয়ালে আঠা দিয়ে সেটে দিয়েছেন। দেখতে অবশ্য ভালই লাগছে। মিঃ কারৌনি এক্ষেত্রে নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এটা তিনি নেহাৎ শখের বশে করেননি কিন্তু। তিনি হিসাব করে দেখেছেন যে, তাঁর ঘরের যা আয়তন তার জন্য রঙিন ওয়ালপেপার কিনতে যা খরচ হবে তার চেয়ে ঐ নোটগুলো দিয়ে দেওয়াল সাজাতে অনেক কম খরচ পড়েছে। কম খরচে দেওয়াল সাজানোর এই অভিনব পন্থা বলতে গেলে মিঃ কারৌনির নিজস্ব আবিষ্কার। এই বিরল কৃতিত্বের জন্য হয়তো তিনি পুরস্কারও পেয়ে যেতে পারেন !

দশ বছর অনাহারে :

আজকাল অনেকে অনশন ধর্মঘট করে থাকেন। না খেয়ে বেশীদিন কিন্তু মানুষ বাঁচতে পারে না। নির্জলা উপবাস করে হয়ত বেশ কয়েক ঘণ্টা কষ্ট করে কাটিয়ে দিতে পারে। তবে এক টানা দশ বছর কোনো রকম শক্ত খাবার না খেয়ে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে যে বিরল দৃষ্টান্ত এক মহিলা স্থাপন করেছেন তা সত্যি বিস্ময়কর। চীনের হুবেই প্রদেশের জিউটাং গ্রামের মিস জিয়াং জাইদিং গত দশবছর ধরে কোনো রকম শক্ত খাবার খাচ্ছেন না। অথচ দিব্যি হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন। শুধু হাঁটা চলাই নয় গৃহস্থালীর কাজও নিয়মিত করে যাচ্ছেন ক্লান্তবোধ করছেন না। আর প্রতিদিন তিনি খাচ্ছেন ঝোল জাতীয় তরল খাদ্য। কি করে গত দশ বছর ধরে এই ঝোল খেয়ে তিনি বেঁচে আছেন তা চিকিৎসকদের কাছেও আশ্চর্যের বিষয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মিস জাইদিং কেন শুধু তরল ঝোলজাতীয় খাদ্য খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন ? এটা কি তার ইচ্ছাকৃত অভ্যাস ? না, তা নয়। আসলে ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি কদিন

ধরে দারুন জ্বরে পড়লেন। তারপর থেকে তার জিভে কোনো স্বাদ নেই। খাওয়াতেই নেই কোনো রুচি। যা খান তাই বমি করে ফেলেন। পেটে কোনো শক্ত খাবার তলায় না। অনেক ডাক্তার বদ্যি দিয়ে চিকিৎসা করালেন। তাতেও কোন ফল হল না। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৯ সালে দিন পনেরো ধরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। ডাকলে সাড়া শব্দ নেই। ডাক্তাররা নাড়ী দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। হৃদ্‌স্পন্দন পর্যন্ত নেই। সবাই ভাবলেন সে যাত্রায় তার আর বাঁচার আশা নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনা থেকেই তিনি সেরে উঠলেন। তাঁর খবরটা এখন অনেকেই জানেন অর্থাৎ না খেয়ে দশ বছর বাঁচার খবর। অনেকে তাকে চিঠি দিচ্ছেন। তার আশা শরীরটা এবার একটু ভাল হবে।

ভাসমান হাসপাতাল :

নদীর ওপর ভাসমান হাসপাতালের কথা আমরা অনেকেই চিন্তা করতে পারি না। অথচ লঞ্চের মধ্যে এ ধরনের হাসপাতালও রয়েছে। গ্রামের লোকদের চিকিৎসার জন্য অনেক সময় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কথা শোনা যায়। অন্ধ্রপ্রদেশে কিন্তু একটা ভাসমান হাসপাতাল রয়েছে। এই হাসপাতালটা চালু হয়েছে একটা লঞ্চের মধ্যে। সেখানে রোগীদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আছেন, ওষুধপত্র আছে আবার রোগীদের সেবার জন্য আছেন নার্স। কারো অসুস্থ হবার খবর পেলেই সেই ভাসমান হাসপাতাল নিয়ে লঞ্চটা হাজির হয় সংশ্লিষ্ট গ্রামে নদীর পাড়ে। রোগীর চিকিৎসা করেন ডাক্তাররা। অন্ধ্রপ্রদেশের কুনাভরম থেকে কলুরুর মধ্যে গোদাবরী নদীর দুই পাড়ে যেসব গ্রাম রয়েছে, সেখানকার অধিবাসীদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছে এই ভাসমান হাসপাতাল।

ধূমপানের খেসারত :

ধূমপানের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী সত্ত্বেও ধূমপান কমছে না। চলন্ত বাসের মধ্যে সিগারেট ধরিয়ে যাঁরা ধূমপান করেন, তাঁরা এখন সাবধান হোন! বাসের মধ্যে সিগারেট ধরিয়ে অহেতুক আপনার বিপদ ডেকে আনবেন না। নানা দিক থেকে এতে আপনার বিপদ আসতে পারে। মানুষের রোষ আপনাকে অনেক দূর টেনে নিয়ে যেতে পারে। অন্তত রোটার্ডামে এই ঘটনাই ঘটেছে। সেখানে ভূগর্ভে বাসে করে যাত্রীরা যাচ্ছিলেন। এক ভদ্রলোকের ইচ্ছে হল সিগারেট ধরাবেন। সবে লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতে যাবেন, অমনি ক্রুদ্ধ ওলন্দাজ সহযাত্রী কামড়ে ছিঁড়ে নিলেন তাঁর নাকের একটা অংশ। কাটা নাক নিয়ে সেই হতভাগা ধূমপায়ী ভদ্রলোক ছুটলেন হাসপাতালে। ডাক্তাররা এখন তাঁর কাটা নাক জোড়া দেবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই ঘটনার কথা পড়ে যাঁরা ট্রেনে বা বাসে নির্বিকারচিত্তে ধূমপান করেন, তাঁরা একটু সাবধান হোন।

কর্তব্যের টানে :

কর্তব্য নিষ্ঠার এক অভূতপূর্ব নিদর্শন পাওয়া গেছে রাজস্থানের ভরতপুর জেলা থেকে। সেখানে ১৯৭৭ সালে যখন প্রবল বন্যা দেখা দিয়েছিল তখন উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যে নিযুক্ত সামরিক বাহিনীর জোয়ানদের মধ্যে এমন একজন ছিলেন যাঁকে পুত্র শোক কিম্বা নিজের স্ত্রীর গুরুতরভাবে অসুস্থ হওয়ার সংবাদও কর্তব্য পালনে বিচ্যুত করতে পারেনি। সেই সামরিক জওয়ান এইখানে থাকা কালে খবর পান তাঁর পুত্র আর ইহজগতে নেই এবং তাঁর স্ত্রী গুরুতর ভাবে পীড়িত। কিন্তু তিনি বিচলিত না হয়ে বন্যা পীড়িতদের মধ্যে কাজ করে যেতে থাকেন। তিনি বলেন যে, তিনি শত শত শিশুর ও তাদের মায়েদের কল্যাণের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। কেবল একজন অসুস্থ মা ও তাঁর মৃত সন্তানের জন্য, এতজনকে ছেড়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

সৌভাগ্যের সন্ধানে

হঠাৎ গুপ্ত ধন ঃ

মাটির তলা থেকে প্রচুর পরিমাণ ধনরত্ন পেয়ে বড়লোক হবার ঘটনা কদাচিৎ ঘটে থাকে। এই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের আলেকজাণ্ডার মিরোনভ। মস্কোর প্রায় ৮ শো কিলোমিটার পূর্বে ভল্‌গা নদীর পাড়ে কাজান শহরের বাসিন্দা মিস্টার মিরোনভ কদিন আগে তাঁর প্রথম বিবাহ-বার্ষিকী পালন করলেন এক বিচিত্র উপায়ে। তাঁর বাড়ির পেছনে একটা পুরনো ঢিবি ছিল। বিবাহ-বার্ষিকীর দিন তিনি সেই ঢিবিটা খুঁড়তে লাগলেন। কিছুটা খোঁড়বার পর কোদালের ডগায় শক্ত কী একটা জিনিস বাঁধলো। অতি সন্তর্পণে তার চারদিক খুঁড়লেন। শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে এলো মাটির তলা থেকে একটা মৃৎপাত্র। সেই মৃৎপাত্রের গা সোনা আর রুপোর পাতে সাজানো। মৃৎপাত্রটা বোঝাই করা মূল্যবান মণিমুক্তো আর এক হাজার মুদ্রায়। মুদ্রাগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর তৈরি। সেই পাত্রের মধ্যে আরো পাওয়া গেল একটা অতি পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া খবরের কাগজের পাতা। ঐ খবরের কাগজ থেকেই আভাস পাওয়া গেছে যে, ঐ গুপ্তধন ১৮২৫ সাল থেকে সেখানে মজুত করে রাখা হয়েছে। বিবাহ-বার্ষিকীতে এত মূল্যবান উপহার তিনি বা তাঁর পত্নী কিন্তু স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি। তাঁরা ঐ মূল্যবান সম্পদ নিয়ম অনুসারে জমা দিলেন সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে। পুরস্কার হিসাবে তাঁরা পেলেন ঐ সম্পদের ২৫ শতাংশ। ভাগ্য গেল ফিরে।

রাখে হরি, মারে কে ?

মাঝে মাঝে কত আশ্চর্যজনক ঘটনাই না পৃথিবীতে ঘটে থাকে। পুরো একুশ দিন ধরে ধসের নিচে চাপা পড়ে থেকে কোন মানুষ যদি প্রাণে বেঁচে যান তবে তা নিশ্চয়ই অবাক করা ঘটনা বলে পরিগণিত হবে। অন্তত দক্ষিণ-পূর্ব চীনে এক খনি শ্রমিকের অদৃষ্টে এই আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটেছে। সেখানে ১৯৮৭ সালের নভেম্বর মাসে এক দুর্ঘটনা ঘটলো। ধসের নিচে তিনি চাপা পড়লেন। পুরো আঠার দিন তিনি জলের মধ্যে ডুবে রইলেন ঐ অবস্থায়। খনিটাতে হঠাৎ এক বিস্ফোরণের ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ঐ খনির মোট ৩৬ জন শ্রমিক ধস চাপা পড়েন। এঁদের মধ্যে ৩৫ জনেরই মৃত্যু ঘটে। একমাত্র ঐ ভাগ্যবান খনি শ্রমিকটিই ২১ দিন পরে প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছেন। উদ্ধারকারী দলের লোকেরা শেষ পর্যন্ত তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছেন। রাখে হরি, মারে কে।

একেই বলে বরাত ঃ

মানুষের ভাগ্য যে কখন কিভাবে ফিরে যায় তা কেউ বলতে পারে না। রাতারাতি কেউ বড়লোক হয়ে যেতে পারে। অবশ্য ভাগ্যদেবী যদি তার প্রতি সুপ্রসন্না হন। কর্ণাটকের এক মহিলা পরিবার পরিকল্পনা করে ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছেন। পরপর দুটি মেয়ে হবার পর ঐ মহিলা তাঁর স্বামীকে নিয়ে একদিন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে গেলেন। সেখানকার চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঐ ভদ্রমহিলা শেষ পর্যন্ত বন্ধ্যাকরণ অস্ত্রোপচার করালেন। এই কাজে উৎসাহিত করার জন্য ঐ মহিলার হাতে কর্ণাটক রাজ্য লটারির পাঁচটা টিকিট উপহার দেওয়া হল। তিনি টিকিটগুলো বেশ যত্ন করেই রেখে ছিলেন। কয়েকদিন পরে ঐ লটারির খেলা হল। আর আশ্চর্য ঐ পাঁচটা, টিকিটের মধ্যে একটাতে বেঁধে

গেল প্রথম পুরস্কার। পুরস্কারের টাকা হিসাবে তিনি পেলেন নগদ এক লক্ষ টাকা। ঐ পরিবার পরিকল্পনা করেই তাঁর ভাগ্য ফিরে গেল। এই ঘটনা জানার পর কর্ণাটকে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে লাইন পড়েছে কিনা জানিনা।

জোর বরাত ঃ

কোনো বাড়ির ছ'তলার ওপর থেকে পড়ে গিয়ে যদি কেউ নিহত না হয়ে অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যান তবে কী বলবেন ? নিশ্চয়ই বলবেন, এটা তাঁর সৌভাগ্য। কথায় বলে—রাখে হরি, মারে কে ? এমনি আশ্চর্যজনক সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছেন পূর্ব বার্লিনের এক শ্রমিক। ছ'তলার জানলার 'ওপর খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি জানালার কাচ পরিষ্কার করছিলেন। হঠাৎ তাঁর পা পিছলে যায়। পড়ে গেলেন বাইরে। নির্ঘাত মৃত্যু। কিন্তু তা হল না। তার পাজামার দড়িটা বাইরে বেরিয়ে ছিল। আর ঐ দড়ি আটকে গেল জানালার নিচে বাইরে বের করা লোহার একটা শিকে। ফলে তিনি শূন্যে ঝুলে রইলেন। ঐ অবস্থাতেই শুরু করলেন চিৎকার—বাঁচাও, বাঁচাও। শ্রমিকটির চিৎকার শুনে নিচে ব্যস্ত সড়কে পথচারীরা দাঁড়িয়ে পড়লেন। বেশ ভিড় জমে গেল। সবাই ওপরের দিকে তাকিয়ে আছেন। কী হয় কী হয় ভাব। এরইমধ্যে খবর গেল পুলিশ আর দমকল বাহিনীর কাছে। তারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন। ঝুলন্ত শ্রমিককে উদ্ধার করতে হবে। সবরকম সতর্কমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হল। শেষ পর্যন্ত তারা উদ্ধার করলেন শূন্যে ঝুলে থাকা ঐ শ্রমিককে। সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

খাটালের মধ্যে স্বর্ণস্তূপ ঃ

আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কার করতে গিয়ে কেউ যদি মূল্যবান সম্পদের সন্ধান পান, তবে তিনি নিশ্চয়ই আলিবাবার মত নিজেকে ভাগ্যবান

মনে করবেন। খাটালের আবর্জনা পরিষ্কার করতে গিয়ে একজনের সেরকম সৌভাগ্যই হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের লিথুয়ানিয়ার ভিলনিয়াসের কাছে মিঃ এডওয়ার্ড নোজভিচ তাঁর খাটালের ময়লা পরিষ্কার করতে গিয়ে পেলেন একরাশ সোনার সন্ধান। খাটালের মাটি খুঁড়তেই তিনি একটা সিমেন্টের বস্তার মধ্যে পেলেন ১ হাজার ৬৭৫টা মার্কিন ডলার, ১৮৬টা কানডিয়ান ডলার এবং ৪০০ ওলন্দাজ মার্ক। এছাড়াও তার মধ্যে থেকে পাওয়া গেল বলশেভিক বিপ্লবের আগে মুদ্রিত ২৪৭টি স্বর্ণ রুবল, বিয়ের ৭০টি আংটি, ছুটি রুপোর বাট, ব্রেসলেট, সোনার হার, আরো অনেক কিছু। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে সত্যিই মানুষ এ রকম গুপ্তধনের সন্ধান পায়। গুপ্তধনের সন্ধানে তাঁকে কষ্ট করে চাঁদের পাহাড়ে উঠতে হয় না বা আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে যেতে হয় না।

বিচারালয় এখন স্বর্ণখনি :

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার বিচারশালাটা এখন স্বর্ণখনিতে রূপান্তরিত হতে চলেছে। এটা ছিল ঐ সময়ে জাপানের বিচারশালা। ফিলিপিন্সের রাজধানী ম্যানিলার ঐতিহাসিক দুর্গ ফোর্ট সান্তিয়াগো। কে জানত তার মাটির তলায় আছে তাল তাল সোনা! জানলে আগেই জায়গাটা দখল করে সোনা তোলার কাজ শুরু হয়ে যেত। বিচারশালার কর্তৃপক্ষ তখন বন্দীদের আনার পরিবর্তে সেখানে নিয়ে আসতেন স্বর্ণখনির শ্রমিকদের। মার্কিন মুলুকের স্বর্ণখনির শ্রমিকরা এখন সত্যি সত্যিই সেখানে সোনা পেতে চলেছেন। ১৯৮৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ঐ জায়গায় খননকার্য শুরু হয়। দিনরাত কাজ চলে। এরই মধ্যে যা নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে এটা পরিষ্কার যে, সেখানে অনেক সোনা আছে। এবং এর সন্ধানে নেমে পড়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

হ্যাঁ, সেই অমূল্য রতন মিলছে। মিলছে বলেই চলছে দিনরাত কাজ। আপনারা অনেকেই হয়তো ভাবছেন—আহা, যদি আগে জানতাম তবে গোটা জায়গাটাই কিনে নিতাম। কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। কপাল চাপড়ালে আর কিছু হবে না।

শতবর্ষের স্বপ্ন সফল :

ব্রিটেনে এক ভদ্রলোক ১১০ বছর বেঁচে থেকে রেকর্ড করলেও তিনি সে দেশের রাজধানী লণ্ডনে যেতে পারেননি নেহাৎ পয়সার অভাবে। অথচ তিনি লণ্ডন থেকে মাত্র আড়াইশো মাইল দূরে ওয়েলেসে থাকেন। তিনি প্রথম ট্রেনে ভ্রমণ করেছিলেন সেই ১৮৯৯ সালে। গিয়েছিলেন ওয়েস্টার্ন টাউন থেকে ব্রিস্টলে। সেই সময় ভদ্রলোকের লণ্ডন যাবার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মাত্র ৫০ পেনির অভাবে তিনি সেখানে যেতে পারেননি। মনের ইচ্ছে মনেই থেকে গিয়েছিল। এমনিভাবে তিনি ১১০টা বসন্ত কাটিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর পুত্র তাঁর সারা জীবনের সাধ পূর্ণ করলেন। সত্তর বছর বয়েসী পুত্রের হাত ধরে এই বৃদ্ধ তাঁর ১১০ বছর বয়সে বেরিয়ে পড়লেন রাজধানী লণ্ডনের উদ্দেশে। সেই দিনটা তাঁর কাছে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ১৯৮৭ সালের ২৬ আগস্ট তিনি লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছলেন। খুশিতে ডগমগ হয়ে তিনি ঘুরে দেখলেন তাঁর স্বপ্নের লণ্ডন শহর। শুধু ছু চোখ ভরে দেখা। বর্তমানে ব্রিটেনের তিনি সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি। খবরটা পৌঁছে গেল সাংবাদিকদের কাছে। তাঁরা এসে হাজির হলেন ঐ বৃদ্ধের কাছে। বৃদ্ধ মজা করে জানালেন তাঁর লণ্ডন শহর ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা। ষাট বছর তিনি কয়লা খনিতে শ্রমিকের কাজ করেছেন।

বন্ধু ট্রেন যাত্রীর জন্য ঃ

ট্রেন সময় মত চলবে এইটাই তো স্বাভাবিক। তাছাড়া ট্রেন তো সামনের দিকেই এগিয়ে চলে। এক ষ্টেশন ছেড়ে এসে নিশ্চয়ই আবার পেছনের সেই ষ্টেশনে ফিরে যায় না। অথচ এ রকমই এক বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে ভূগর্ভের রেল পথে। অবশ্য আমাদের দেশে নয়। মিশরের রাজধানী কায়রোতে। নিয়মবিধির বাইরেও সেদিন ট্রেন চলেছিল। ট্রেনটা প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছিল কায়রোর দিকে। হঠাৎ তারেক আজিজ নামে এক যাত্রীর মনে পড়লো তার মেয়ের বিয়ের বাজার করার ফর্দ অনুযায়ী একটা জিনিস তো কেনা বাকী আছে। মেয়ের বিয়ে বলে কথা, সে কি আর হতে পারে? আজ বাদে কাল বিয়ে। আবার কে ঝামেলা পোহাতে চায়। সুতরাং ব্যাপারটা ট্রেন চালকের কানে তোলা হল। ট্রেনটা আবার পিছিয়ে এলো আজিজ সাহেবের বাজার করার জন্য। অন্যান্য যাত্রীরা অবশ্য ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেননি। আসলে ঐ ট্রেনের চালক মহম্মদ ইউনুস ছিলেন আজিজ সাহেবের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে একটু সাহায্য করা তো বন্ধুত্বের পরিচয়। অবশ্য এরজন্য ঐ চালককে তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিরল ঘটনা

মরা মানুষের সেবা ঃ

মরা মানুষের বেঁচে ওঠার অনেক বিচিত্র ঘটনার কথা শোনা যায়। আসলে কিন্তু সেই মানুষটা বেঁচে থাকেন, মরার মত মনে হয়। দীর্ঘ ৮ বছর ধরে একটা মরা মানুষকে অসুস্থ ভেবে তাঁর পত্নী ও দুই সন্তান নিয়মিত সেবা করে যাচ্ছেন, এমন ঘটনার কথা শুনলে অবশ্য চমকেই উঠতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনোসিসের নক্সভিলে কার্লস্টিভেন্স নামে এক অসুস্থ ভদ্রলোকের অবস্থা আট বছর আগে খুব সঙ্কটজনক হয়ে উঠল, শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুও ঘটল। তার আগে থেকেই তিনি দীর্ঘদিন ধরে রোগে ভুগছিলেন। নড়া-চড়ার ক্ষমতা পর্যন্ত ছিল না। দেহ হয়ে গিয়েছিল অস্থিচর্মসার। তার পত্নী বা সন্তান কেউই বুঝতে পারেননি যে তিনি মারা গেছেন। নিয়মিত তার জামা-কাপড় ও বিছানার চাদর বদল করে দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ৮ বছর পরে তাঁরা জানতে পারলেন, এতদিন ধরে তাঁরা মরা মানুষ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। ইলিনোসিসের শেরিফ জানিয়েছেন, স্টিভেন্সের দেহে হাড় আর চামড়া ছাড়া কিছু ছিল না। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এই আট বছর ধরে ঐ মানুষটা মলমূত্র ত্যাগ করলেন না বা খাদ্যগ্রহণ করলেন না—এতেও তাঁর পরিবারের লোকজনেরা কিছু বুঝলেন না। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, মৃতদেহ থেকে কোন দুর্গন্ধও বের হয়নি।

শিশুর পেটে শিশু ঃ

মানুষের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে অনেক অনেক গবেষণা চালিয়েছেন। মাঝে মাঝে প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল লক্ষ্য করা যায় মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে। যমজ শিশু একসঙ্গে তিনটি শিশু জন্মাবার ঘটনা মাঝে

মাঝে শোনা যায়। এতে আমরা এখন খুব বেশি বিস্মিত হই না। তবে সদ্যজাত কোন শিশুর পেটের ভেতর যদি আর একটা শিশুর অস্তিত্ব ধরা পড়ে তবে সাধারণ মানুষ কেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা পর্যন্ত অবাক হয়ে যাবেন। এমনি এক অবাক করা কাণ্ড ঘটেছে আসামের ডিব্রুগড়ে। সেখানে আসাম মেডিকেল কলেজে একটি শিশু জন্মাল। ডাক্তারেরা দেখলেন ঐ শিশুটার পেটের মধ্যে আর একটা ছোট্ট শিশু রয়েছে। সদ্যোজাত শিশুর পেটে এক্সরে করে তার অস্তিত্ব ধরা পড়লো। উপায় নেই তাই শিশুটার পেটে অস্ত্রোপচার করে বের করা হল আর একটা ছোট্ট শিশুকে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এরকম ঘটনা একেবারেই বিরল। তাই ভাল-ভাবে গবেষণা চালাবার জন্য দুটি শিশুকেই সেখানকার মেডিকেল মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। অবশ্য জীবিত অবস্থায় নয়, মৃত অবস্থায় রাখা হয়েছে ওষুধ দিয়ে।

আটত্রিশ দিনের ব্যবধানে যমজ :

যমজ সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বিস্ময়কর ঘটনার কথা শোনা যায়। সাধারণত কোন মহিলার যমজ সন্তান হলে তা একই দিনে পরপর হয়ে থাকে। ব্যবধান থাকে কয়েক মিনিটের। কিন্তু ইটালির তিভোলিতে এক মহিলা যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন প্রায় ছ'সপ্তাহের ব্যবধানে। ভেনিজুয়েলা-নিবাসী ঐ মহিলার নাম মিসেস ড্যানি বার্গ। এই যমজ সন্তানের মধ্যে প্রথম সন্তানটি ছিল কন্যা সন্তান। মাত্র আটশো গ্রাম ওজনের ঐ শিশুটির জন্ম দেবার ৩৮ দিন পরে তিনি দু কিলোগ্রাম ওজনের আরও একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এটা সত্যিই অবাক করা ঘটনা। খবরে জানা গেছে, যে সারা পৃথিবীতে এ পর্যন্ত এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে মাত্র ছটি। তবে এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে যমজ সন্তানের জন্ম দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে মাত্র একটিই।

মৃত মহিলার সন্তান প্রসব :

কোন গর্ভবতী মহিলার মৃত্যুর সাত সপ্তাহ পরে তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, এরকম আশ্চর্যজনক ঘটনার কথা আমরা কেউই শুনিনি। অথচ সত্যিই এই ঘটনা ঘটেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তক্লারায় একটা হাসপাতালে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ঐ মৃত মহিলা ১.৯ কেজি ওজনের একটা স্বাস্থ্যবতী কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। ঐ মহিলার পেটে অস্ত্রোপচার করে ঐ শিশু কন্যাটিকে ভূমিষ্ঠ করেছেন হাসপাতালের চিকিৎসকরা। এর সাত সপ্তাহ আগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় তাঁকে 'ক্লিনিক্যালীডেড' বা মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। মেরী হেণ্ডারসন নামে ঐ মহিলাকে ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তিন দিন পরে তিনি মারা গেলেন। তখন তিনি ৬ মাসের গর্ভবতী। সেটা ছিল ৭ জুনের ঘটনা। চৌত্রিশ বছর বয়স্কা ঐ মহিলাকে এর পর সাত সপ্তাহ ধরে জীবন চালু রাখা ব্যবস্থা, ডাক্তারী শাস্ত্রে যাকে বলে 'লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম' নিয়ে ঐ বেডে শুইয়ে রাখা হল। এই সময়ের মধ্যে ঐ ভদ্রমহিলার বাবা-মা আর স্বামীর মধ্যে আইনের দ্বন্দ্ব শুরু হল। প্রশ্নটা হল গর্ভের শিশুটিকে ভূমিষ্ঠ হতে দেওয়া হবে কি না। 'মৃত' ভদ্রমহিলার বাবা মা চাইছিলেন, শিশুটাকে মরতে দেওয়া হোক। কিন্তু মৃতার স্বামী চাইছিলেন তাকে বাঁচিয়ে রাখা হোক। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আপস হল। শিশুটি জন্মের পর যে যন্ত্রটার সাহায্যে কৃত্রিমভাবে তার মাকে 'বাঁচিয়ে' রাখা হয়েছিল তার সুইচ অফ করে দেওয়া হল। এবারে ঐ ভদ্রমহিলা যথার্থ ই মরলেন।

হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস বদলের পর সন্তান :

যাঁর হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস বদল করা হয়েছে এমন একমহিলা যদি সন্তান প্রসব করেন তবে তাতে আশ্চর্য হতে হয় বৈকি। আর

এই আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে লণ্ডনে। সেখানে এক মহিলা গত ৫ ফেব্রুয়ারি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। পশ্চিম লণ্ডনের হিলিংডন হাসপাতালে ২২ বছরের বয়স্কা এক মহিলা মিসেস দিবে লিওনার্দ ২ কেজি ৭শো গ্রাম ওজনের এক পুত্রসন্তান প্রসব করে বলতে গেলে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিন বছর আগে ঐ মহিলার হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুস দুইই বদল করা হয়েছে।

মিসেস লিওনার্দ উত্তর ইংলণ্ডের ব্রাডফোর্ড শহরে একটা পর্যটন কোম্পানির অফিসের কর্মী। তাঁর জন্মের সময় থেকে হৃৎযন্ত্রে একটা গর্ত ছিল। এর ফলে দেখা দেয় উচ্চ রক্তচাপ। ফলে ফুসফুসে দোষ দেখা দেয়। বাধ্য হয়ে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস বদলাতে হয়। ১৯৮৫-র জুলাই মাসে লণ্ডনের হেয়ার ফিল্ড হাসপাতালে তাঁর হৃদযন্ত্র ও ফুসফুস বদল করা হয়। তারপর এই তিন বছর পরে তিনি জন্ম দিলেন ঐ পুত্রসন্তান। চিকিৎসা জগতের ইতিহাসে এই ঘটনা রীতিমত বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

শিশুর হৃৎপিণ্ড বদল :

মানুষের হৃদযন্ত্র বদল করাটা এখন আর কোন জটিল ব্যাপার নয়, এটা জামা-কাপড় পাল্টানোর মতই সহজ ব্যাপার। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, মাত্র ১৮ দিনের একটা শিশুর হৃদযন্ত্র বদল করা। বদলের আঠারো দিন আগে যখন ঐ শিশুটি জন্মগ্রহণ করে তখন থেকেই তার হৃদযন্ত্রে ত্রুটি ছিল। ফলে শরণাপন্ন হতে হল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোমা লিণ্ডা ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারে রেনি নামে ঐ শিশুটির দিব্যি হৃদযন্ত্র বদল করা হল। শিশুটির অবস্থা উদ্বেগজনক হলেও অবস্থা আর খারাপের দিকে যায় নি। এই হৃদযন্ত্র বদলের অস্ত্রোপচার করেন ডাঃ নিওনার্দ বেইলি। উক্ত হাসপাতালে ঐ শিশুটিকে নিয়ে ১২ জনের হৃদযন্ত্র বদলের কাজ হল। ডাঃ লিওনার্দ ১৯৪৮ সালে একটা

বেবুনের হৃদযন্ত্র বসিয়ে দেন সদ্যোজাত একটি শিশুর দেহে। এ নিয়ে তখন প্রচণ্ড বিতর্ক ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়। অবশ্য হৃদযন্ত্র বদলের ২০ দিন পরে সেই শিশুটি মারা যায়।

হৃদরোগের বিরুদ্ধে যন্ত্র ঃ

চিকিৎসকদের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার ফলে মানুষ রীতিমত মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বেঁচে থাকছে। অনেক সময় আবার মানুষ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়। তখন চলে যমে-মানুষে লড়াই। এখন যমের সঙ্গে মানুষের লড়াই নয়, এবার এই লড়াইয়ে নামছে যন্ত্র। বর্তমান যুগটা যান্ত্রিক সভ্যতার যুগ। তাই যন্ত্র যে মানুষের সঙ্গী হয়ে দাঁড়াবে, এইটাই স্বাভাবিক। এখন মানুষের হৃদরোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নামছে ডেফিব্রিলেটর নামে একটা যন্ত্র। নতুন আবিষ্কার করা এই যন্ত্র হৃদরোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবে। এর ফলে বর্তমানে হৃদরোগের আক্রমণে সারা পৃথিবীতে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ মারা যান, তার হার বহুলাংশে কমানো যাবে। বিজ্ঞানীদের এ এক আশ্চর্য আবিষ্কার। নিউ অর্লিয়ন্স থেকে সম্প্রতি এই বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কারের খবরটা পাওয়া গেছে। হৃদরোগে যাঁরা ভুগছেন তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই এটা একটা সুখবর। তবে এতে কিন্তু মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো যাবে না।

ধূমপায়ীরা সাবধান ঃ

সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর—এ কথা বহুদিন ধরে শুনে আসছি। সিগারেটের প্যাকেটের ওপর এই সতর্কবাণী লেখা থাকা সত্ত্বেও সিগারেট খাওয়া কেউ বন্ধ করেছেন বলে বড় একটা শোনা যায় না। সিগারেট খাওয়ার বিপদের চেয়েও আরো মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে ধূমপানের পর ফেলে দেওয়া জ্বলন্ত

সিগারেটের টুকরো। ত্রিবান্দ্রম মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক সি. আর. সোমান একথাই জানিয়েছেন। অনেক গবেষণার পর তিনি বলেছেন, আমরা যে সিগারেট খাই তার চেয়ে ফেলে দেওয়া একটা জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো থেকে পাঁচ গুণ বেশি কার্বন-মনোক্সাইড ও তিন গুণ বেশি নিকোটিন নির্গত হয়। অধ্যাপক ডাঃ সোমান আরো জানিয়েছেন যে, ধূমপায়ীদের কাছে থাকলেও কিন্তু অনেকের ধূমপানজনিত রোগ হতে পারে। কেননা একজন ধূমপায়ী ধূমপান করার সময় তাঁর কাছে যিনি থাকেন, তাঁর নিঃশ্বাসের সঙ্গে কিছু সিগারেটের ধোঁয়া তাঁর ফুসফুসে ঢুকে যায়।

এই গবেষণায় জানা গেছে যে, ধূমপায়ী ব্যক্তিদের পত্নীরা অনেক সময় অপুষ্ট ও কম ওজনের শিশু সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকেন।

ডাঃ সোমান আমাদের আরো বিপজ্জনক খবর জানিয়েছেন। আর সেই খবরটা হল—একটা সিগারেট ধূমপান করলে গড়ে ধূমপায়ীর ৫ মিনিট ৫ সেকেণ্ড করে আয়ু কমে যায়। যিনি দিনে কুড়িটা করে সিগারেট খান, তাঁর আয়ু কমে যায় পাঁচ বছর। সুতরাং ধূমপায়ীরা সাবধান!

হেঁচকি ওঠা বন্ধে :

আমাদের মধ্যে কারো কারো ক্রমাগত হেঁচকি ওঠে। ঘন ঘন হেঁচকি ওঠা অনেক সময় থামতেই চায় না। কি মুস্কিল বলুন তো? এই হেঁচকি ওঠার একটা ভাল দাওয়াই শুনুন। না না কোন তেতো বা কড়া ওষুধ খেতে হবে না, স্রেফ কিছুটা চিনি চুষে বা গিলে খান। এতে আশা করি কিছুটা কমবে। না, এতেও যদি হেঁচকি ওঠা বন্ধ না হয়, তবে নিঃশ্বাস বন্ধ করে চোখের ওপর চাপ সৃষ্টি করে নাকে কিছুটা গোল মরিচের গুঁড়ো দিন। ব্যাস্ হাঁচি পাচ্ছে তো? যত খুশি হাঁচি হোক। কিন্তু হেঁচকি ওঠা তো থেমে গেল। পশ্চিম জার্মানির চিকিৎসকেরা সম্প্রতি এই দাওয়াই বাতলেছেন। অবশ্য

পশ্চিম জার্মানির চিকিৎসক অধ্যাপক গ্যাডগিবস জানিয়েছেন যে, ফলডল জাতীয় ওষুধ হেঁচকি ওঠা বন্ধ করতে ভাল ফল দেয়। এই ওষুধ খেয়েও কিন্তু আবার অনেকের কাজ হয়নি, এমন অভিযোগও শোনা গেছে। আর এই অভিযোগটা করেছেন আমেরিকার জ্যাক পোর্ডিও নামে এক ভদ্রলোক। তিনি দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে হেঁচকি ওঠা রোগে ভুগছিলেন। অনেক কিছু করেছেন। এই ওষুধও খেয়েছেন দিনের পর দিন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর রোগ সারেনি। শেষ পর্যন্ত স্রেফ ভগবানের কাছে তিনি প্রার্থনা জানিয়েছেন। সেণ্ট জাস্টিনের কাছে প্রার্থনা জানালেন—ঈশ্বর আমায় রোগ মুক্ত কর। আর আশ্চর্য তার এই দীর্ঘ ১৮ বছরের রোগ মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে সেরে গেল।

নাক ডাকা নিয়ে সমস্যা ঃ

রাত্রে ঘুমোবার সময় পাশে শুয়ে কেউ নাক ডাকলে কার না বিরক্তি লাগে ? অনেকে ঘুমোবার সময় এত জোরে নাক ডাকেন যে সত্যি ভয় হয়। স্ত্রীর পাশে শুয়ে স্বামী নাক ডাকার ফলে বিরক্ত হয়ে স্ত্রী স্বামীকে ডিভোর্স করেছেন এমন কথাও শোনা গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই নাক ডাকার কারণ কী ? এটা কি কোন অসুখ ? ডাক্তারদের ধারণা যাদের গলা সরু অথচ দারুণ ঘুমকাতুরে তাঁরাই বেশি নাক ডাকেন। ঘুমের মধ্যে প্রশ্বাস ও মুখের গঠনের কিছু বিকৃতির ফলেই এই নাক ডাকার উৎপত্তি বলে তাঁদের ধারণা। পাশ্চাত্য দেশে আবার নাক ডাকা বন্ধে নানা ওষুধের কথা শোনা যায়।

বিচিত্র ঘুম সমীক্ষা ঃ

রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুমানো এবং ভোরে ঘুম থেকে উঠে কাজকর্মে মন দেওয়া—এইটাই তো নিয়ম। পৃথিবীর বেশীর ভাগ

দেশের মানুষ এই ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। এর ব্যতিক্রমও আছে। ঘুমানোর পদ্ধতিও আবার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের। ইউকাটনের (Yucaton) মায়ান জাতির লোকেদের ব্যাপার স্যাপার সত্যিই অদ্ভুত। তারা সন্ধ্যা থেকে ঘুমিয়ে রাত তিনটের সময় ঘুম থেকে উঠে পড়ে। হাত মুখ ধুয়ে ঐ রাত তিনটের সময়ই প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করে। টিয়েরা ডেল ফুগোর ইয়াহানদের ঘুমের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। তারা ঘুমায় প্রয়োজন অনুযায়ী। শরীর যখন ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে আসে তখনই তারা ঘুমিয়ে নেয়। আবার যেই ক্লান্তি দূর হয়ে শরীরটা বেশ চাঙা হয়ে ওঠে তখনই তারা ঘুম থেকে উঠে পড়ে। এটা একটা বিচিত্র ধরনের নিয়ম।

মালয়েশিয়ার তেমিয়াররা এবং সারাওয়াক-এর ইবানরা সাধারণতঃ দিনে ৬ ঘন্টার বেশী ঘুমায় না। এদের মধ্যে কিছু লোকজন, বিশেষ করে মেয়েরা আবার সারারাত ধরে হয় রান্নাবান্না ও ঘরকন্যার অন্যান্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অন্য কাজ না থাকলে অনেকে আবার সারারাত ধরে কাঠ কাটে।

সারা পৃথিবীর মানুষের ঘুমের অভ্যাস নিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে এইসব তথ্য জানা গেছে। এই সমীক্ষায় আরো জানা গেছে যে, নিউ গিনির দক্ষিণাঞ্চলের কিছু কিছু মানুষ আবার তাদের মৃত আত্মীয়দের মাথার খুলি বাড়ীতে রেখে দেয়। রাত্রে সেই মাথার খুলির ওপর তারা ঘুমায়। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কেন এই বিচিত্র প্রথা? আসলে ঐ সব লোকেদের মরা মানুষের ঐ মাথার খুলিতে আছে মন্ত্রশক্তি। এই 'মন্ত্রশক্তি' তাদের দেহে শক্তি যোগায়। এর ওপর ঘুমালে তাদের শরীরে শক্তি বেড়ে যায়। অবশ্য এই বিশ্বাসের পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য আছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। আবার এও জানা গেছে যে পাশ্চাত্য দেশগুলির মানুষদের সুনিদ্রার অনুকূল পরিবেশ আছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলির লোকেরা

ঘুমের প্রচলিত নিয়ম মেনে চলে তাদের চেয়ে বেশ সুখেই ঘুমোতে পারে।

ঘুম-ঘর :

ঘুমের মধ্যে মানুষ অনেক সময় অনেক সুখের স্বপ্ন দেখেন। আবার ঘুমের মধ্যে অনেকে দেখেন নানান দুঃস্বপ্ন। ঘুম মানুষের কাছে আরামের। তাই শান্তিতে সকলেই ঘুমোতে চান। এ ব্যাপারে রাজা-মহারাজা থেকে আরম্ভ করে গরিব মানুষ পর্যন্ত সকলেই সমান। তবে ঘুমের আবার রকমভেদ আছে। ঘুমের জন্য আলাদা একটা গবেষণাগার গড়ে উঠেছে, এমন কথা শুনলে ঘুম-কাতুরেরা হয়তো তেমন উৎসাহিত হবেন না, তবে যাঁরা অনিদ্রা রোগে ভোগেন তাঁরা নিশ্চয়ই কিছুটা পুলকিত হবেন। উত্তর মেরুর দুশো মাইল দূরে ট্রমস্কোতে গড়ে উঠেছে ঘুমের গবেষণাগার। ঘুম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুধু নয়, অনিদ্রা রোগীদের ঘুম পাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা আছে ঐ গবেষণাগারে। নরওয়ের অধিবাসীরাই বেশি করে অনিদ্রা রোগে ভোগেন। এই অনিদ্রার কারণ হল দিনের আলোর অভাবে তাঁদের দেহে মেলাটোনিন নামের হরমোনটি তৈরি হয় না। এই হরমোনই মানুষকে ঘুম পাড়ায়। অনেকের হয়তো জানা নেই যে, নভেম্বর মাসের শেষভাগ থেকে জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নরওয়েতে বেশির ভাগ সময়ই সূর্যের আলো থাকে না। ফলে এই ঘুমপাড়নি হর্মোন তৈরি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

ট্রমস্কোর ঐ ঘুম-গবেষণাগারে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে মানুষের শরীরে ঐ বিশেষ ধরনের হরমোন তৈরির ব্যবস্থা আছে। এর ফলে অনেকে ঘুমিয়ে পড়েন। তবে সেখানে নাচের ক্লাব, স্কি, খেলার ব্যবস্থা—সব মিলিয়ে দারুণ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা। ঘুমের দেশে গিয়ে এতসব মজাদার ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে কে না ভালবাসে।

কৃত্রিম রক্তে চিকিৎসা :

কৃত্রিম রক্তের কথা আমরা অনেকেই শুনেছি। চিকিৎসার জন্য কৃত্রিম বিকল্প রক্ত নিয়ে পৃথিবীর কয়েকটা দেশে গবেষণার কাজ চলছে। রক্তের বিকল্প তৈরিতে জাপান এখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। এর পরই চীনের স্থান। সম্প্রতি ভিয়েৎনাম সীমান্তে লড়াইয়ে যেসব চীনা সৈন্য আহত হয়েছেন, কৃত্রিম রক্ত দিয়ে তাদের চিকিৎসার কাজ চালানো হয়। ডাক্তাররা তাদের শরীরে কৃত্রিম রক্ত ঢুকিয়ে তাদের বাঁচাতে সমর্থ হয়েছেন। রোগীর রক্তের গ্রুপ যাই হোক না কেন সবার শরীরেই এই রক্ত দেওয়া যায়। স্বাভাবিক রক্তের মত এই রক্তও অক্সিজেন বহন করতে আর কার্বন ডাই অক্সাইড বর্জন করতে পারে। চিকিৎসকদের ধারণা গবেষণাগারে তৈরি এই বিকল্প রক্ত হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক আর ধমনীর চিকিৎসায় সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে। চীনের ইনস্টিটিউট অফ অর্গানিক কেমিষ্ট্রি সংস্থায় এই রক্ত তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন থার্ড মিলিটারী মেডিকেল ইউনিভার্সিটি অ্যাণ্ড হাসপিটালসের বিশেষজ্ঞরা।

গাজর খাবার ওজর :

আলুর দাম যখন প্রচণ্ড বাড়ল, তখন একজন নেতা বলেছিলেন, কাঁচকলা খাও। কাঁচকলার খাদ্যগুণের কথা আমরা অনেকেই জানি। আর তাই ভেবেই হয়তো ঐ রাজনৈতিক নেতা সগর্বে ঐ কথা বলেছিলেন। তা নিয়ে পরবর্তীকালে অনেকে অনেক ঠাট্টা-তামাশা করেছেন। কলার কথা থাক। এখন আমরা বরঞ্চ গাজরের কথায় আসি। অনেকে মুড়ির সঙ্গে কাঁচা গাজর খেয়ে থাকেন। আবার গাজর কেটে স্যালাডও তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু এই গাজর যে আমাদের জীবন ধারণের পক্ষে কতটা মূল্যবান খাদ্যবস্তু তা আমরা অনেকেই জানি না। কোন বয়স্ক ব্যক্তি যদি

দিনে অন্তত দুটো গাজর খান, তবে তাঁর দৈনিক ভিটামিন 'এ'-র চাহিদা পূরণ হয়। ফলে শরীর ভাল থাকে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে এই তথ্য জানিয়েছেন অতি সম্প্রতি। তাঁদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ভিটামিন 'এ' ছাড়াও গাজরে থাকে প্রচুর পরিমাণ আলফা ও বিটা ক্যারোটিন যা আমাদের শরীরের সঙ্গে খুবই প্রয়োজনীয়। এছাড়া গাজরে আছে ভিটামিন 'সি', স্নেহ পদার্থ, শর্করা, আমিষ আর খনিজ লবণ। সবগুলিই কিন্তু আমাদের দৈনিক খাদ্য তালিকার মধ্যে প্রয়োজন। সুতরাং এখন থেকে গাজর খেতে আরম্ভ করুন। ভয় পাবেন না, গাজর খেয়ে একটুও মোটা হয়ে যাবেন না। তবে শরীরে নিশ্চয়ই শক্তি যোগাবে এই গাজর। তাই বলে শুধু গাজর খেয়েই দিন কাটাতে বলছি না। অন্য খাবারও নিশ্চয়ই খাবেন।

মাছের গুণ :

রোজ যদি খাবারের সঙ্গে কিছু পরিমাণ মাছ খাওয়া যায় তবে রক্তে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। খাদ্যে যে চর্বি জাতীয় পদার্থ থাকে তা কমাতে সাহায্য করে এই মাছ। মাছে-ভাতে বাঙালিদের পক্ষে সত্যিই এটা সুখবর। অবশ্য মাছটা সস্তা হলে। কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার এক সমীক্ষায় এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে—যে সমস্ত প্রাণীকে খাদ্যের সঙ্গে শুধুমাত্র নারকেল তেল দেওয়া হয়েছে তাদের রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ যে সমস্ত প্রাণীকে নারকেল তেলের সঙ্গে মাছের তেল দেওয়া হয়েছে তাদের চেয়ে প্রায় **১.৫** গুণ বেশি। সাধারণ তেলের থেকে মাছের তেল আলাদা ধরনের। এতে আছে বেশ কিছু পরিমাণ চর্বি প্রতিরোধক পদার্থ।

বিষময় চা :

এক কাপ চা যা আপনার আমার দেহের ক্লান্তি দূর করতে পারে, তা আবার মারাত্মক বিষক্রিয়ারও সৃষ্টি করতে পারে—একথা

হয়তো অনেকের জানা নেই। লক্ষ্ণৌ-এর শিল্প বিষবিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণা কেন্দ্রের একদল বিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, চায়ের পাতা থেকে সিসে নির্গমনের পরিমাণ নির্ভর করে সরাসরি জলের তাপমাত্রার ওপর। ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে স্ফুটনাঙ্কের তাপমাত্রার মধ্যে সিসে নির্গত হতে থাকে। এতে অ্যাসিডের স্তরও থাকে। অধ্যাপক টি. ডি. শেঠের নেতৃত্বাধীন এই সমীক্ষক দলটি দেখছেন যে উচ্চ তাপমাত্রায় চায়ের পাতা খুব বেশিক্ষণ ভিজিয়ে রাখলে তা থেকে এই বিষাক্ত পদার্থ বেশি পরিমাণে নির্গত হয় যা চা-পানকারীদের পক্ষে বিপদের কারণ হতে পারে।

চা পানে দীর্ঘ জীবন :

প্রতিদিন বেশ কিছু পরিমাণ চা খান এবং দীর্ঘজীবী হোন। চায়ের মধ্যে দীর্ঘজীবী হবার গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে। বৃটেনের দুই যমজ বোন রবিনা ও মার্গারেট তাঁদের সুখী জীবন ও দীর্ঘজীবী হবার পেছনে চায়ের অবদানের কথা জানিয়েছেন। বৃটেনে বর্তমানে জীবিতদের মধ্যে তাঁদের দুজনের বয়স সবচেয়ে বেশি। তাঁরা দিনে অন্তত দশ কাপ চা খান। এঁরা সম্প্রতি তাদের ৯৬-তম জন্মদিন বেশ ধুমধামের সঙ্গেই পালন করলেন। তাঁরা এই বয়সেও বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে যান। দিনে দশ কাপ চা পান করলেও রবিনা ও মার্গারেট কিন্তু মদ্যপান বা ধূমপান করেন না।

সাপের কামড়ে বেঁচে থাকা :

তোমাদের কারো দেহে কি কোন দুষ্প্রাপ্য গ্রুপের রক্ত আছে? যদি থাকে তবে বিষাক্ত সাপ কামড়ালে তোমার বেঁচে থাকবার সম্ভাবনাটা বেশি। পাটনার ফরেনসিক ল্যাবোরেটরিতে গবেষণা করে দেখা গেছে যে, গোখরো সাপের বিষ বিভিন্ন ধরনের রক্তে বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিশেষ করে দুষ্প্রাপ্য

গ্রুপের রক্তে এর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন রকমের। দুষ্প্রাপ্য ধরনের রক্ত যাদের শরীরে থাকে তাদের বিষাক্ত সাপে কামড়ালে প্রাথমিক চিকিৎসাতেই ভাল কাজ হয়।

মাথা ধরায় দারুণ ওষুধ ঃ

আপনাদের কারো কি প্রায়ই মাথা ধরে? কারো কি মাথা ধরা রোগ আছে? না, না মোটেই চিন্তিত হবেন না। অনেকে মাথাধরা সারাতে বাজার থেকে নানারকম ট্যাবলেট খেয়ে থাকেন। তাতে মাথাধরা তখনকার মত সারে বটে, কিন্তু স্থায়ী সমাধান হয় না। আবার এইসব ওষুধে অনেক সময় শরীরের ক্ষতি হয়। স্থায়ীভাবে মাথাধরা সারানোর এমন একটা ওষুধ পাওয়া গেছে যা আপনারা কেউ কোনোদিন চিন্তা করতে পারেননি। ব্যাপারটা এমন কিছু জটিলও নয়। ভোরে সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠে স্রেফ তিনটি কচি মাদার পাতা চিবিয়ে খান। একদিন, দুদিন তিনদিন। ব্যাস, আর খেতে হবে না। দেখবেন চিরকালের মত আপনার মাথাধরা রোগ সেরে গেছে। ফলে আপনাকে আর অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে হবে না। শুধু মাথাধরা রোগের ক্ষেত্রে নয়—কলেরা, টাইফয়েড, জণ্ডিস, স্নায়ুর দুর্বলতা প্রভৃতি রোগ নিরাময়ে মাদার পাতা একটা অব্যর্থ ওষুধ। অবশ্য এই শেষোক্ত অসুখগুলির জন্য প্রতিদিন ভাতের সঙ্গে এক সপ্তাহ ধরে এই আয়ুর্বেদিক ওষুধ খেতে হবে। এমনকি স্মৃতিশক্তি বাড়াতেও মাদার পাতা অদ্বিতীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত আয়ুর্বেদ গবেষক মিস্টার মিলাইণ্ড সিম্পাই সম্প্রতি গবেষণা চালিয়ে এই তথ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি মাদার পাতার চিকিৎসায় প্রায় পাঁচশো রোগীর মাথাধরা সারানোর কৃতিত্ব দাবি করেছেন। চিকিৎসা শুরু করার প্রথম দিনে সন্ধ্যায় রোগীদের মাথা ধরার যন্ত্রণা কমেছে শতকরা ৫০ ভাগ আর দ্বিতীয় দিনে শতকরা ৮০ ভাগ আর তৃতীয় দিনে তাঁরা

সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছেন। আপনারা অনেকেই হয়তো তাঁর আরোগ্য নিকেতনে যেতে চাইছেন, তাই না?

কাটা হাত জোড়া :

ইরানে একদল অস্থি সংক্রান্ত শল্যচিকিৎসক একজন কারিগরের দুর্ঘটনায় কাটা যাওয়া হাত সাফল্যের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। হোসেন হায়দারি নামে ঐ কারিগর বিদ্যুৎচালিত করাতে কাজ করতে গিয়ে একটা হাত খোয়ালেন। দুর্ঘটনার ৪৫ মিনিট পরে তাঁকে কাটা হাত সহ হাসপাতালে নিয়ে আসা হল। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রোপচারের কাজ শুরু হল। সাফল্যের সঙ্গে কাটা হাত সংযোজন করা হল। এখন ঐ রোগী ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠছেন।

টেকো মাথায় চুল :

মাথার চুল উঠে গিয়ে যাদের মাথায় তেল চকচকে টাক পড়েছে তাঁদের অনুশোচনার অন্ত নেই। টেকো মাথা নিয়ে তাঁরা অনেক সময় সমস্যায় পড়েন। মাথা ভরা চুল নিয়ে সগর্বে ঘুরে বেড়ানোর একটা আলাদা আনন্দ আছে। টাক মাথার লোকদের তাই বিরস বদনে ঘুরে বেড়াতে হয়। এ ধরনের টেকোদের সমস্যা সমাধানের কাজে এগিয়ে এসেছেন জাপানের চিকিৎসা বিশেজ্ঞরা। তাঁরা এমন এক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি অর্থাৎ অস্ত্রোপচার শুরু করেছেন যার সাহায্যে টাক মাথার লোকদের মাথায় চুল গজাতে সাহায্য করেছে। এই ধরনের অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মাথার খুলির ওপরের চামড়া কেটে তাতে ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে অক্সিজেন। এই অক্সিজেন টেকো মাথায় নতুন চুল গজাতে সাহায্য করেছে। সেদেশে চল্লিশ জন টেকো মাথার ব্যক্তির ওপর তাঁরা এই অস্ত্রোপচারের পরীক্ষা চালিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ছাব্বিশ জনের মাথায় চুল গজিয়েছে টেকোরা এখন নিজেরাই অবাক হয়েছেন মাথায় নতুন করে চুল

গজাতে দেখে। ব্যাপকভাবে এই পরীক্ষার সাফল্য দেখা দিলে হয়তো অচিরেই এই চিকিৎসা পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে। তবে যাঁদের টাকের সমস্যা আছে তাঁদের জাপানে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে আসার কথা বলছি না। কেননা এরজন্য খরচ অনেক।

হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ভারতেও এই চিকিৎসা পদ্ধতি চালু হতে পারে। সুতরাং মাভৈঃ। আপাতত ইচ্ছে করলে মাথায় পরচুলো পরে ঘুরে বেড়াতে পারেন।

উল্টোপাল্টা চিকিৎসা :

কারো চোখে ছানি পড়েছে কিন্তু অস্ত্রোপচার হল কিডনিতে। আর একজনের কিডনিতে পাথর জমেছে তার কাটা হল চোখের ছানি। কী ভয়ানক কাণ্ড বলুন তো! এই কাণ্ড ঘটেছে আমাদের দেশে নয়, বিদেশে। ব্রাসেলসের একটা হাসপাতালে। ৬৭ বছর বয়স্ক অ্যালবার্ট মিগননের চোখের ছানি কাটার কথা ছিল। কিন্তু তার কিডনিতে অস্ত্রোপচার করা হল। অপারেশনের পর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরলো তখন তিনি দেখলেন চোখের বদলে তাঁর পেটে ব্যাণ্ডেজ করা রয়েছে। আর একজন রোগীর কিডনিতে পাথর জমেছিল।

শিশুদের ক্যান্সার প্রতিরোধ চিকিৎসা :

ক্যান্সার রোগাক্রান্ত শিশুদের জীবনের নতুন আশা দেখা দিয়েছে। তাদের মজ্জা চুম্বকের সাহায্যে পরিশ্রুত করে ক্যান্সার রোগ থেকে মুক্ত করার এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। লণ্ডনে একদল চিকিৎসক গবেষণা করে এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, ক্যান্সার রোগাক্রান্ত ঐ শিশুদের অস্থির ভেতরে সুস্থ মজ্জাকে রোগাক্রান্ত মজ্জা থেকে চুম্বক ব্যবহারের মাধ্যমে পরিশ্রুত করে আলাদা করা হয়। পরে

সেই মজ্জা আবার যথাস্থানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। গত বছর এপ্রিল মাসে এই ধরনের ১৮টি শিশুকে এই পদ্ধতির মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৭টি শিশু বেঁচে আছে। ঐ চিকিৎসক-দলের প্রতিনিধি হিসাবে ডাক্তার জেনিফার ট্রিলিডেন একথা জানিয়েছেন।

ভাবী সন্তান ছেলে না মেয়ে :

কথায় বলে—জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—তিন বিধাতা নিয়ে। কন্যা সন্তান জন্মালে আমরা অনেকেই এখনো মনে মনে খুশি হতে পারি না। পুত্র সন্তান জন্মালে সারা বাড়ীতে বলতে গেলে খুশীর বন্যা বয়ে যায়। কিন্তু কোন গর্ভবতী মহিলা আগে থেকে বুঝবেন কি করে যে তাঁর পুত্র সন্তান জন্মাবে না কন্যা সন্তান জন্মাবে? আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে অবশ্য গর্ভাবস্থায় এক্স-রে করে অনেক সময় তা নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে। আবার বাড়ীর বয়স্কা মহিলারা অনেক ক্ষেত্রে গর্ভবতী মহিলার আচার আচারণ ও লক্ষণ দেখে অনুমান করতে পারেন আগত সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সব সময় হিসাবটা মেলে না। শ্বাশুড়ীরা গর্ভবতী পুত্রবধূদের সাধ ভক্ষণের সময় ছটি ধামার একটার নিচে নোড়া আর অপরটার নিচে প্রদীপ রেখে দেন। না দেখে সাধ ভক্ষণকারী মহিলাকে যে কোন একটা ধামা তুলতে বলা হয়। ধামা তুলে যদি তার নিচে নোড়া দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে আগন্তুক সন্তান হবে পুত্র। অন্য ধামাটা তুললে বুঝতে হবে ভাবী সন্তান হবে কন্যা। কিন্তু এটা অনেকটা সংস্কারের মত। এটা অনেকটা লটারীর টিকিট কাটার মত। কেউ সঠিকভাবে বলতে পারবেন না—কোন্ টিকিটে পুরস্কার উঠবে।

কিন্তু এ ব্যাপারে ত্রিপুরার এক আদিবাসী সম্প্রদায় একেবারে অদ্ভুত বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। ঐ আদিবাসী সম্প্রদায় অন্তঃস্বত্বা মহিলাদের চেহারা দেখেই বলে দিতে পারেন ছেলে হবে না মেয়ে

হবে। সেখানকার জামাতিয়া সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, কোনো গর্ভবতী মহিলা যদি অনুভব করেন যে, তাঁর তলপেটের ডানদিকটা বেশী ভারী লাগছে তবে নির্ঘাত তার ছেলে হবে। আর যদি তলপেটের বাঁদিকটা বেশী ভারী মনে হয় তবে তিনি অবশ্যই কন্যা সন্তানের জন্ম দেবেন।

সম্প্রতি তপশিলী সম্প্রদায় ও অদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের গবেষণা বিভাগের এক অফিসার ঐ সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে এই তথ্য জানিয়েছেন।

বিচিত্র প্রতিযোগিতা

'সুন্দরী বিধবা প্রতিযোগিতা' ঃ

'বিশ্বশ্রী' প্রতিযোগিতা, 'বিশ্ব সুন্দরী' প্রতিযোগিতা বা বিভিন্ন দেশের নিজস্ব 'সুন্দরী' প্রতিযোগিতার কথা শোনা গেছে। 'সুন্দরী বিধবা' প্রতিযোগিতার কথা আমরা কখনও শুনিনি। থাইলাণ্ডে এ ধরনের একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সবচেয়ে 'সুন্দরী বিধবা' প্রতিযোগিতায় ১৮ বছর থেকে ৪৮ বছর বয়স্কা ৪৫ জন বিধবা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এইসব মহিলাদের বেশির ভাগেরই স্বামী কোন না কোন দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। প্রতিযোগিতায় প্রথম হলেন ২৩ বছর বয়স্কা মিসেস ভিত্তায়া থান্নুপন। সেই সুন্দরীর স্বামী ছিলেন একজন দক্ষ বিমান চালক। আর বিমান দুর্ঘটনাতেই ভদ্রলোকের মৃত্যু ঘটে।

টাকের টাকায় উন্নয়ন ঃ

আমরা বেশিরভাগ লোকই যখন মাথার টাক ঢাকবার জন্য চেষ্টা করি, সেইসময় টাকের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করাটা নিঃসন্দেহে একটা খুশির খবর। থাইল্যাণ্ডে সম্প্রতি এই 'টেকো' প্রতিযোগিতায় ১৩ জন টেকো যোগ দিয়েছিলেন। কার টাক সবচেয়ে সুন্দর ? অবশ্যই একজন টেকো প্রথম হয়েছিলেন। আর এই সুন্দর টাকের জন্য তিনি পুরস্কারও পেয়েছেন। তাই বলে কারো পত্নীই কিন্তু চান না যে তাঁরা স্বামী বিরাট টাকের অধিকারী হোন। সুতরাং টেকোরা এই প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত হলেও যাদের সামান্য টাক পড়তে শুরু করেছে তারা সাবধান। সবচেয়ে ভাল খবরটা হল—ঐ প্রতিযোগিতায় যে অর্থ পাওয়া গিয়েছিল, তা ঐ অঞ্চলে একটা গ্রামের উন্নয়ন তহবিলে দান করা হয়েছে। উদ্দেশ্য মহৎ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

যাঁদের মাথায় টাক পড়েছে বা যারা খুসকিতে ভুগছেন, তাঁদের পক্ষে একটা সুখবর আছে। পাঞ্জাবের আয়ুর্বেদিক বিভাগের ডাক্তার এ, এন, শাস্ত্রী মাথায় টাক সারাতে এক ধরনের লতাগুল্ম দিয়ে একটা ওষুধ তৈরি করেছেন। ঐ ডাক্তার জানিয়েছেন। যে, এই ওষুধে খুসকি তো সারবেই, উপরন্তু গোড়া থেকে সব চুলকে কালো এবং উজ্জ্বল করে তুলবে। এই লতাগুল্মের সাহায্যে তিনি যে তেল তৈরি করেছেন তা বহু সংখ্যক মানুষের উককারে লেগেছে।

'চামচা' প্রতিযোগিতা ঃ

'চামচা' কথাটার সঙ্গে বর্তমান যুগে আমরা অনেকেই কম বেশি পরিচিত। চামচাগিরি করে অনেকে এখন করে খাচ্ছে। আর এই চামচাগিরি কথার অর্থটা নিশ্চয়ই কাউকে বলে দিতে হবে না। সোজা কথায় কারো তোষামোদ করাকে বলা হয়ে থাকে চামচাগিরি করা। আর এখনকার দিনে এই চামচাদের সংখ্যা সর্বত্রই বেড়ে চলেছে। কি রাজনীতি, কি সাহিত্য, কি শিক্ষা-সব ক্ষেত্রে এখন চামচাদের প্রাধান্য। এই চামচাদের জন্য একটা সুখবর আছে। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় চামচাগিরির এক বিরাট প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। বিশ্বে এইটাই প্রথম 'চামচা প্রতিযোগিতা'। আর আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে এতে এত বেশি প্রতিযোগী যোগ দেবার জন্য নাম লিখিয়েছিলেন যে, উদ্যোক্তাদের রীতিমত হিমসিম খেতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন প্রতিযোগীর সংখ্যা কমানো হবে। তাই শেষ দিকে যারা নাম দিয়েছিলেন অগত্যা তাদের প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দিতে হল। এই প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকে চার মিনিট করে সময় দেওয়া হয়েছিল। ইচ্ছামত কোন একজনের হয়ে চামচাগিরি করার জন্য। যা খুশি তাই প্রতিযোগীরা বলতে পেরেছেন, অবশ্য অশ্লীল কোন কথা কাউকে বলতে দেওয়া হয়নি। প্রতিযোগিতার নিয়মই ছিল

আদিরসাত্মক কোন কিছু বলা যাবে না। বলা বাহুল্য প্রতিযোগীদের মধ্যে সরকারি অফিসার থেকে শুরু করে বাড়ির গৃহিণীরা পর্যন্ত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত একজন অফিসারই 'চামচাগিরি'তে প্রথম হয়েছেন বলে জানা গেছে।

থুথু ফেলার প্রতিযোগিতা :

পৃথিবীতে অনেক রকম প্রতিযোগিতার কথা শোনা গেছে। কিন্তু থুথু ফেলা প্রতিযোগিতার কথা হয়ত কেউ শোনেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইস্‌কিনসনের পারদিভিল্লেতে কিছুদিন আগে এই বিচিত্র প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। সেখানে তরমুজ খাওয়া ও থুথু ফেলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তরমুজ খেয়ে থুথু ফেলতে হবে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে। কে কত দূরে থুথু ফেলতে পারেন সেটাই ছিল প্রতিযোগিতার প্রধান বিষয়। বলা বাহুল্য এই প্রতিযোগিতায় যিনি সবচেয়ে বেশি দূরে থুথু ফেলতে পারবেন তিনি হবেন প্রথম। আর এ ব্যাপারে বিশ্বরেকর্ড করতে পারলে নিশ্চয়ই তার নাম গিনিস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান পাবে। অবশ্য প্রতিযোগিতার আর একটা বিষয় ছিল কম সময়ে কে কত বেশি তরমুজ খেতে পারবে। তরমুজ খাওয়া প্রতিযোগিতায় একজন রেকর্ড করেছেন। তিনি মাত্র ৬,৫৫ সেকেণ্ডে এক কিলো ওজনের একটা তরমুজ খেয়ে রেকর্ড করেছেন বটে, কিন্তু থুথু ফেলা প্রতিযোগিতায় আগের রেকড কেউ ভাঙতে পারেননি। স্থানীয় এক সূত্রধর ১২,৩ মিটার দূরে পর্যন্ত থুথু ফেলে প্রথম হয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশ্বরেকর্ড আছে ১৪'৩ মিটার দূরত্বের। তা হোক, তবুও এই প্রতিযোগিতার আকর্ষণ কিন্তু কম ছিল না। প্রচুর লোক এই প্রতিযোগিতায় দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ঐ সূত্রধর ও তরমুজ খেয়ে যিনি রেকর্ড করেছেন, তাঁদের দুজনকেই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। রেকর্ড না হলেও আপাতত পুরস্কার পেয়েই তাঁরা খুশি।

ধূমপান প্রতিযোগিতা ঃ

ধূমপান স্বাস্থের পক্ষে ক্ষতিকর—এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হলেও ধূমপানের বহর কিন্তু কমছে না। এটা সারা পৃথিবীতে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধূমপানের অনেক প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে এখানে ওখানে। সুইজারল্যাণ্ডের ওটলেন শহরে সেদিন ধূমপানের এক বিচিত্র প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। এটা ছিল পাইপের সাহায্যে ধীরগতিতে ধূমপান করার প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগীদের প্রত্যেককে তিনগ্রাম করে তামাক আর ছুটি করে দেশলাই দেওয়া হল। পাইপে তামাক ভরাট করতে ৫ মিনিট সময় ও পাইপের তামাকে আগুন ধরাতে এক মিনিট সময় দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতাটা হচ্ছে, কে কত তাড়াতাড়ি ধূমপান করতে পারেন—তা নয়, কে কত ধীরে ধীরে পাইপ টেনে ধোঁয়া ছাড়তে পারেন। অবশ্য এই প্রতিযোগিতা দেখতে অনেক দর্শক সমাগম হয়েছিল। তবে দর্শকদের জন্যও একটা শর্ত ছিল। প্রতিযোগিতা চলাকালে প্রতিযোগীরা ছাড়া কোন দর্শক ধূমপান করতে পারবে না। কোন দর্শক দেশালাই পর্যন্ত জ্বালতে পারবে না। এটা ছিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হলেন সাত বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লুই সোল টারম্যান। তিনি তাঁর খেতাব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলেন। ১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাসে এই প্রতিযোগিতা প্রকাশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং গোপন করার কোন ব্যাপার নেই।

উটপাখির ডিম খেয়ে বিশ্ব রেকর্ড ঃ

১৯৮৬ সালের আগষ্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কেপ টাউনে বিচিত্র প্রতিযোগিতায় একজন প্রতিযোগী ৩ মিনিট ৬ সেকেণ্ড সময়ে ১ কিলো ৩০ গ্রাম ওজনের একটা উটপাখির ডিম খেয়ে রীতিমত বিশ্ব রেকর্ড করলেন। কিন্তু অপর প্রতি যোগীরাও দমবার পাত্র

নন। এগিয়ে এলেন আর একজন কৃষক প্রতিযোগী। চব্বিশটা মুরগীর ডিমের সমান আর একটি উটপাখির ডিম যার ওজন ছিল ১ কিলো ৩৫ গ্রামের অনেক বেশি। তা তিনি ৫ মিনিট ৩৫ সেকেণ্ডে গড়লেন নতুন বিশ্বরেকর্ড। সুতরাং উটপাখির ডিম খাওয়ার বিশ্বরেকর্ড দু দুবার ভাঙা হল।

পনের মিনিটে ৩২টি ইডলি :

তরমুজ খাওয়া প্রতিযোগিতার কথা অনেকে শুনে থাকবেন। অবশ্য এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রসগোল্লা বা দই খাবার প্রতিযোগিতার কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। দিল্লিতে সেদিন মহা আড়ম্বরের সঙ্গে ইডলি খাওয়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। কে কত তাড়াতাড়ি বেশি ইডলি খেতে পারেন তাই ছিল প্রতিযোগিতার বিষয়। এ ব্যাপারে দর্শকদের অনেকেই অবাক হলেন এক গবেষকের কাণ্ড দেখে। গোগ্রাসে তিনি মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে ৩২টা ইডলি খেয়ে রীতিমত তাক লাগিয়ে দিলেন। শরণন গিরি নামে এই প্রতিযোগী সঙ্গে সঙ্গে জিতে নিলেন প্রথম পুরস্কারটা। আর দ্বিতীয় হলেন দেশিকান নামে একজন কলেজ ছাত্র। তিনি ঐ ১৫ মিনিটে খেয়েছেন ২৪টা ইডলি। অবশ্য ঐ ছাত্রটা তার কলেজে এখন রীতিমতো হিরো। তবে রাক্ষস বলে কেউ তাঁকে ভাবছেন বলে এখনো শোনা যায়নি। কেননা সত্যি সত্যিই তো তিনি রোজ এরকম গোগ্রাসে ইডলি খান না।

দ্রুত খাওয়ার রেকর্ড :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টমাস গ্রিন দ্রুত খাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। এক কিলোগ্রাম ওজনের শামুক খেতে তাঁর সময় লেগেছে মাত্র ২ মিনিট। টমাস গ্রিন জাহাজে কাজ করেন। নিবাস মেরিল্যাণ্ড। বয়স ৪৫। পাত্র থেকে একের পর এক ২০০টি শামুক তিনি মুখে পুরেছেন। একবার মাত্র থেমেছিলেন জল খাবার জন্য।

বিচিত্র বিশ্ব রেকর্ড

দাড়ি নিয়ে বিচিত্র রেকর্ড ঃ

দাড়ি কামানোর ব্যাপারে বিশ্বরেকর্ডের কথা শুনলে অনেকেই নড়েচড়ে বসবেন। জানতে চাইবেন দাড়ি কামানোর আবার বিশ্বরেকর্ড কী করে হয়? গেরি হারলে নামে এক নরসুন্দর এই বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে তাঁর নাম এখনো জ্বলজ্বল করছে। তিনি এক ঘণ্টায় কত লোকের দাড়ি কমিয়েছেন জানেন? না, হাজারখানেক লোকের নয়, মাত্র ৯৮৭ জনের। একবার ভাবুন তো গেরি হারলের এই বিশ্বরেকর্ডের জন্য যারা তাঁর কাছে দাড়ি কামিয়েছেন তাঁদের অবস্থাটা। অবশ্য এত দ্রুত দাড়ি কামাতে গিয়ে কারো গাল কেটে তিনি রক্ত ঝরিয়েছেন, তেমন কথা শোনা যায়নি। যাই হোক এই নরসুন্দর তো বিশ্বরেকর্ড করেছেন। তিনি সৌভাগ্যবান বলতে হবে।

দাড়ির কথায় যখন এলাম, তখন আর একটা খবর দিই। রোমের সম্রাট ছিলেন ক্যালিগুলার। তাঁর মাথায় হঠাৎ একটা উদ্ভট বুদ্ধি এল। তিনি ভাবলেন যে তিনি একজন সম্রাট। সুতরাং সাধারণ মানুষের চেয়ে তিনি আলাদা। তাই সাধারণ মানুষের মত দাড়ি রাখলে তো আর তাঁকে সম্রাট বলে প্রজারা গণ্যমান্য করবে না। তাই গ্রীক দেবতা জুপিটারের পাথরের মূর্তিতে যেরকম দাড়ি ছিল তিনি এক স্বর্ণকারকে ডেকে তারই অনুকরণে সোনার তারের এক দাড়ি বানাবার হুকুম দিলেন। স্বর্ণকার সম্রাটের আদেশ মত কিছুদিনের মধ্যে সোনার নকল দাড়ি তৈরি করে দিলেন। মাথায় সোনার মুকুট আর মুখে সোনার দাড়ি পরে সম্রাট ক্যালিগুলার দিব্যি রাজত্ব শাসন করে গেলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, এতে প্রজারা তাকে দেবতা জ্ঞানে পূজো করবে। প্রজারা তাকে

পূজো করতেন কিনা জানা যায়নি। তবে সোনার দাড়ি পরার ক্ষেত্রে তার এই বিচিত্র রেকর্ড এখনো কাউকে ভাঙতে শোনা যায়নি।

দাড়ি নিয়ে একটা বিশ্বরেকর্ডের কথা বলি। সবচেয়ে লম্বা দাড়ি রেখে বিশ্বরেকর্ড করার কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন……না নিশ্চয়ই তিনি কোন নারী নন, অবশ্যই পুরুষ মানুষ। পুরুষ, তাই বলে কিন্তু তাকে 'শ্মশ্রু সম্রাট' আখ্যা দিলে আমাদের আপত্তি করার কিছু নেই। কেননা এ ব্যাপারে তিনি সত্যিই সম্রাট, অবশ্য 'দাড়ির সাম্রাজ্যে'। নরওয়ের হ্যান্স ল্যাংমেথ এই কৃতিত্বের অধিকারী। তিনি দাড়ি রেখেছিলেন ১৭ ফুট লম্বা! অবশ্য নাম ল্যাংমেথ হলে কী হবে, তিনি কাউকে ল্যাং মেরে দাড়ির বিশ্বরেকর্ড করার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাননি। অবশ্য তাই বলে তার দাড়ি মাটিতে লুটিয়ে ফেলে তিনি পথ চলতেন না। দাড়িটাকে গুটিয়ে বেঁধে রাখতেন। নিয়মিত দাড়ির পরিচর্যাও করতেন বেশ ভালভাবে। ভদ্রলোক এখন বেঁচে নেই। তাই তাকে এখন দেখবার সৌভাগ্য আর কারো হবে না। তবে তার দাড়িটাকে দেখবার সৌভাগ্য অনেকেরই হতে পারে এখনো। ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর রেকর্ডের অধিকারী দাড়িটাকে মুখ থেকে কেটে নিয়ে সযত্নে রাখা হয়েছে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনে। আপনারা কেউ নরওয়েতে গেলে সেখানে ঐ দাড়িটাকে একবার দেখে আসতে পারেন।

লম্বা গোঁফের রেকর্ডধারী খুন :

পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা গোঁফওয়ালা মানুষের মুণ্ডু কাটা গেছে। যে মানুষটা তাঁর সযত্নে লালিত গোঁফের জন্য বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন, যাঁর নাম গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জ্বল জ্বল করে লেখা আছে। তাঁকে কিনা এভাবে খুন করা হবে, এটা কেউ কি ভাবতে পেরেছে? রাজস্থানের জয়সলমিরে বাড়ির কাছেই কারনি ভিল

নামে ঐ বিরাট গোঁফওয়ালা লোকটি ১৯৮৮ সালের ২রা জানুয়ারি খুন হয়েছেন। তাঁর খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখন রাজস্থানে গভীর রহস্য ঘনীভূত হয়েছে।

আসলে কারনি ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত। এই ডাকাতের নাম শুনে ঐ অঞ্চলের অনেকেই একদিন চমকে উঠত। কত মানুষের মাথা হয়তো তিনি কেটেছেন। কিন্তু এখন নিজের মাথাই বাঁচাতে পারলেন না। তবে তাঁর ডাকাতির জীবন ছেড়ে দিয়ে তিনি সুস্থ জীবনে ফিরে এসেছিলেন। সংস্কার হওয়া ডাকাত কারনি রাজস্থানি সঙ্গীতযন্ত্র 'নাদ' বাজাতে ওস্তাদ ছিলেন। কারাবন্দী থাকার সময়ই তিনি ঐ বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শিখেছিলেন। গোঁফটাও রাখা শুরু করেন ঠিক সেই সময় থেকেই। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হিসাবে কারনি জয়সলমিরে পর্যটকদের আনন্দ দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে থাকেন। তাঁর ৬ ফুট লম্বা গোঁফ চিবুকের কাছে গোটানো ছিল। এটা তাঁকে একটা কিংবদন্তীতে পরিণত করেছে। তাই এ নিয়ে জার্মানে ও ফ্রান্সে দুটি চলচ্চিত্র হয়েছে। রাজস্থান সরকারের পর্যটন দপ্তরের পোস্টারে তাঁর ছবি রীতিমত বিশেষ স্থান পেয়েছে।

বিশ্বশান্তির জন্য দীর্ঘতম চিঠি ঃ

বিশ্বশান্তির জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা চিঠি লিখে বিশ্বরেকর্ড করার কৃতিত্ব একজন ভারতীয়র। কেরালা নিবাসী রেগান জন্স নামে ২৯ বছরের ঐ যুবক পোপ দ্বিতীয় জন পলকে ২'৪ কিলো-মিটার লম্বা চিঠি লিখেছেন। তাঁর আবেদন—দোহাই, বিশ্বশান্তির জন্য আপনি প্রচেষ্টা চালান। এই দীর্ঘ চিঠিটা লিখতে তাঁর সময় লেগেছে সাড়ে তিন বছর। প্রতিদিন গড়ে বার ঘণ্টা করে তিনি চিঠি লিখে গেছেন। চিঠির ওজন প্রায় একশো কেজি। বিশ্বরেকর্ডের গিনেস বুকে এটা স্থান পাবে বলে তিনি আশা করেন। বিশ্বশান্তির

জন্য আবেদন ও নানান ঘটনা ছাড়াও ঐ চিঠিতে আছে ভারতে পোপের দশদিনের সফর। জন্স এই চিঠি লেখায় এতই মত্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, তিনি ঐ চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়েও এখনও চিঠি লেখার অভ্যেস ছাড়তে পারেননি। এখন তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নেতাদের উদ্দেশে লিখে চলেছেন দীর্ঘ চিঠি। সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, আমি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু চিঠি লেখা ছাড়ব না। সত্যি, ভদ্রলোকের নিষ্ঠা আছে বলতে হবে !

সাঁইত্রিশ বছর ধরে অজ্ঞান :

সবচেয়ে বেশিদিন অজ্ঞান অবস্থায় কাটানর ব্যাপারেও বিশ্বরেকর্ড আছে। আর এই বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার মিসেস এলেন। অবশ্য আমরা একে কৃতিত্ব বলে আখ্যা দিলেও ঘটনাটা নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক। মাত্র ৬ বছরের শিশু থাকা কালে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে ফ্লোরিডার হাসপাতালে ভর্তি করা হল। ডাক্তাররা নানারকম চিকিৎসা করলেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান আর কিছুতেই ফিরে এল না। একদিন, দুদিন নয়, এক বছর দু বছর নয়, একটানা ৩৭ বছর ধরে তিনি অজ্ঞান হয়ে রইলেন। ঐ অজ্ঞান অবস্থাতেই ইঞ্জেকশন করে তার শরীরের পুষ্টি যোগানো হত। খাবার খাওয়ানো হত কৃত্রিম উপায়ে। এইভাবে এলেন বেঁচে রইলেন এতদিন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এরকম ঘটনা সত্যিই বিরল। আর আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে এলেনের জ্ঞান আর কোনদিন ফিরে এল না। দীর্ঘ ৩৭ বছর অজ্ঞান থেকে অজ্ঞান অবস্থাতেই কিছুদিন আগে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে ৪৩ বছর বয়সে। তাঁর বাড়ির লোকজনরা নিশ্চয়ই আশা করছিলেন তিনি হয়ত একদিন জ্ঞান ফিরে পাবেন। কিন্তু অজ্ঞানতার অন্ধকারেই থেকেই তাঁর মৃত্যু হওয়াতে আত্মীয়স্বজনরা

নিশ্চয়ই ভেঙে পড়েছেন। ভেঙে পড়বারই কথা। আর শুধু আত্মীয়স্বজন নয়, হাসপাতালের ডাক্তার নার্সরা পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুতে চোখের জল ফেলেছেন। সকলকে কাঁদিয়ে তিনি চলে গেলেও রেখে গেছেন অজ্ঞান অবস্থায় দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার এক বিশ্বরেকর্ড।

রত্নগর্ভা নয়, দীর্ঘগর্ভা :

দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে কোনো মহিলা গর্ভধারণ করে আছেন—খবরটা শুনলে অনেকেই নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবেন। আশ্চর্য হবারই কথা। কেননা আমরা তো জানি বাংলা হিসেবে সর্বোচ্চ ১০ মাস ১০ দিন বা ডাক্তারি মতে ২৮০ দিন কোনো মহিলা গর্ভধারণ করেন। অনেকের আবার আট মাসেই সন্তান প্রসব হয়ে থাকে। মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর মিশন হাসপাতালে সত্যিই একটি অবাক করা কাণ্ড ঘটেছে। ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসের ৪ তারিখে এক ভদ্রমহিলা পেটে দারুণ ব্যথা নিয়ে ভর্তি হলেন ঐ হাসপাতালে। ডাক্তাররা অনেক ওষুধ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই ভদ্রমহিলার পেটের ব্যথা আর সারে না। শেষ পর্যন্ত ডাক্তাররা তাঁর পেটে এক্স-রে করলেন। অবাক কাণ্ড, ভদ্রমহিলার পেটের মধ্যে রয়েছে একটা পরিণত শিশু। পরে জানা গেল, ভদ্রমহিলা কুড়ি বছর আগে গর্ভবতী হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সন্তান প্রসব হয়নি। আর তিনি কোনোদিন প্রসব যন্ত্রণাও অনুভব করেননি। তাই গর্ভসঞ্চার সম্পর্কে তাঁর আর তেমন কোনো অসুবিধে হয়নি। লজ্জায় তিনি কাউকে ব্যাপারটা জানাননি। হঠাৎ কুড়ি বছর পরে, পেটে যন্ত্রণা হতেই তিনি শরণাপন্ন হলেন ডাক্তারদের। তারপর এই বিচিত্র ব্যাপার। ডাক্তাররা শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচার করে তাঁর পেট থেকে বের করে আনলেন এক মৃত সন্তানকে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ঘটনা বলতে গেলে দুর্লভ। শিশুটি মৃত অবস্থায় এতদিন ধরে মাতৃ জঠরেই ছিল। কী করে ছিল এবং ভদ্রমহিলার কেন

এতে তেমন কোনো অসুবিধে হয়নি, আর ভদ্রমহিলা পেটে মরা সন্তান নিয়ে কী করেই বা এতদিন বেঁচে ছিলেন—সেইটাই আশ্চর্যের বিষয় !

গুহাতে থাকার রেকর্ড :

এবার আসছি গুহাতে থাকার রেকর্ডের কথায়। ইটালিতে এগারজন পুরুষ ও তিনজন মহিলার একটি দল ৪৯ দিন পরীক্ষামূলক ভাবে ভূগর্ভে কাটিয়ে গত ১৯৮৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি গভীর গুহা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। ঐ দলে ছিলেন একজন চিকিৎসক ও দূরদর্শনের একজন ক্যামেরাম্যান। দলটির নেতৃত্ব দেন প্রবীণ গুহা-বিশেষজ্ঞ মাউরিজিও মন্তালিও। তিনি ইতিপূর্বে গত বছর জুলাই মাসে ২১০ দিন একাই ভূগর্ভে থেকে বিশ্বরেকর্ড করে বেরিয়ে এসেছেন। ঐ গুহাবাসী দলটি পূর্ব ইটালিতে মাটির তলায় গুহা থেকে বাইরে আলোতে যখন বেরিয়ে আসেন তখন তাঁদের বেশ সুস্থ ও উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল।

বিশ্বসেরা মোটা :

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে মোটা মানুষটার ওজন কত জানেন ? মাত্র ৫৭৫ কেজি ! লম্বায় তিনি ছ' ফুট আর তার পেটের বেড় ন'ফুট। ওটাল্টার হাডসন নামে ৪২ বছর বয়স্ক এই লোকটাকে ঘরের বাইরে এনে ওজন করতে হয়। ঘরের বাইরে এনে তাঁকে ওজন করতে দমকলবাহিনীর সাহায্য নিতে হয়। মানুষের প্রাত্যহিক ব্যবহারের ওজন-দাঁড়ি এক্ষেত্রে কাজে লাগেনি। ভারী জিনিসপত্র ওজনের যন্ত্রের সাহায্যে তাঁর দেহের ওজন করা হয়েছে। মেদাধিক্যের জন্য তিনি প্রায় উঠতেই পারেন না। দিনরাত বিছানায় শুয়ে কাটান। জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ তিনি শুয়েই কাটিয়েছেন। গত ১৬ বছর ধরে তিনি বিছানার চাদর ছাড়া

কিছুই পরতে পারেননি। মেদাধিক্যের জন্য ১৫ বছর বয়স থেকেই তিনি বিছানাবন্দী। মাথায় ছোট ছোট চুল।

সবচেয়ে আনন্দের খবর হল, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ১ বছর অক্লান্ত চেষ্টায় এখন তাঁর দেহের ওজন ১৬৯ কেজি কমেছে। এতদিন বিছানা থেকে তাঁকে বাইরে আনতে ক্রেনের প্রয়োজন হত। কিন্তু ১৯৮৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর কারো বিশেষ সাহায্য ছাড়াই ভদ্রলোক অর্থাৎ এই মোটাবাবু ঘরের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়েছেন। সেখানে মিলিত হয়েছেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে। আর সেই সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হবার জন্য সাদা তাঁবুর স্টাইলে তাঁর জন্য তৈরি করা হয়েছিল বিশেষ একটা শার্ট। সেটা তৈরি করতে কাপড় লেগেছে ৬·৩ মিটার। ভদ্রলোক দিনে তিনবার অর্থাৎ সকালে, তুপুরে ও রাত্রে আহার করেন। তাঁর প্রাতরাশের মেনুতে থাকে তু পাউণ্ড বেকন, ১২টা ডিম, ১২টা রোল, সেই অনুপাতে জ্যাম ও কফি। ভদ্রলোকের গায়ের রঙ ফর্সা। মুখে সদাই হাসি লেগেই আছে। মেদ কমিয়ে ইচ্ছামতো চলাফেরা করতে পারলে তিনি তাঁর প্রয়াতা মায়ের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করবেন। এইটাই এখন তার একমাত্র ইচ্ছা।

তবে বিশ্বরেকর্ডে বইয়ের তার নাম লিখা নেই। কোন মানুষের ওজন যদি ৪শো কেজির ওপর হয় তবে তাকে কেমন দেখাবে ঠাট্টা করছি না সত্যিই গোল পিপের মত দেখতে বিরাট ভুড়িওয়ালা মানুষ এই পৃথিবীতেই এখনো আছেন, যার শরীরের ওজন ৪০৪ কেজি। অন্তত পৃথিবীর সবচেয়ে মোটা মানুষ হিসাবে তিনি এখন বিশ্বরেকর্ড করে বসে আছেন। তাকে এখন কেউ স্থানচ্যুত করতে শত চেষ্টা করলেও পারবেন না। এই ভদ্রলোকটির নাম টি জে অ্যালবার্ট জ্যাকসন। নাম শুনেই বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই কোন দেশের লোক। তাকে এক তুজনে মিলে ঠেলে সরাতে পারা রীতিমত শক্ত। হ্যাঁ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর এক ভদ্রলোক তো এ ব্যাপারে

আরে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। তার দেহের ওজন ছিল আরো বেশি—৪৪২ কেজি। অবশ্য এখনো পর্যন্ত ঐটাই বিশ্বরেকর্ড হয়ে আছে। তবে তিনি এখন বেঁচে নেই। ১৯৮৩ সালে তার মৃত্যু ঘটে। এখানেই ব্যাপারটা ইতি টানছি না। আরো একটা মজার খবর দিই জন ব্রোয়ার জিনোক নামে ঐ ভদ্রলোক বিছানায় শুয়ে পড়লে পাশ ফিরতে পারতেন না, তার বিরাট ভুঁড়িওয়ালা মেদবহুল শরীরের জন্য। বিছানার একপাশ থেকে অন্যপাশে তাকে গড়িয়ে দিতে লাগত ১৩ জন লোক। ভদ্রলোকের পক্ষে একটা ক্রেন কেনা ভাল ছিল। অবশ্য আর এখন তাকে এ বুদ্ধিটা দেওয়া নিরর্থক। কেননা তিনি এখন পরপারে চলে গেছেন।

বৃহত্তম দূরবীন ঃ

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা কোথায় আছে যদি প্রশ্ন করি তবে আপনারা অনেকেই হয়ত গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে যাবেন না, আপনাদের কারো সাধারণ জ্ঞান যাচাই করছি না। তবে খবরটা দিই। সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা তৈরী করছে। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে দু হাজার তিনশো মিটার উঁচু সোভিয়েত উজ্‌বেকিস্তানের সাফা (suffa) মালভূমির এক জায়গার এই দূরবীনটা বসানোর কাজ চলেছে। এর সাহায্যে অবশ্যই বহু দূরের জিনিষ এমনকি হাজার হাজার মাইল দূরের জিনিষ পরিষ্কার দেখা যাবে। যে জায়গায় এই দূরবীনটাকে বসানো হচ্ছে সেখান থেকে ভূ-পৃষ্ঠ নয়, উত্তর আকাশের পুরোটা এবং দক্ষিণ আকাশের অনেকটা পর্য্যবেক্ষণ করা যাবে। অনন্ত মহাকাশে আছে অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র। শক্তিশালী এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রে এমন অনেক সুক্ষাতিসুক্ষ্ম যন্ত্রপাতি থাকছে, যার সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্রপুঞ্জের অনেক অজানা রহস্য জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা উম্মোচিত করতে পারবেন। মহাকাশের অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান দেবে পৃথিবীর এই বৃহত্তম

ও শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি। আমাদের সামনে মহাকাশ সম্পর্কীত নতুন নতুন জ্ঞানের দুয়ার খুলে যাবে।

সবচেয়ে বড় ঘণ্টা :

বাড়ীতে কোনো পূজো উপলক্ষ্যে ঘণ্টা বাজানো হয়। পুরুত মশাইরা ঘণ্টা নেড়ে পূজা করেন। বিভিন্ন মন্দিরে অনেক সময় ঘণ্টা বাধা থাকে বেশ বড় বড় ঘণ্টা। আর পূণ্যার্থীরা মন্দিরে ঢুকে এইসব ঘণ্টা বাজিয়ে থাকেন। কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঘণ্টা কোথায় আছে তার খবর আমরা অনেকেই রাখিনা। আর এই ঘণ্টার ওজন কত আমাদের অনেকের জানা সেই, এই ঘণ্টা বর্তমানে সোভিয়েট ইউনিয়নের একটা মিউজিয়ামে রাখা আছে। এর ওজন ১৯৮ টনের মত। ঘণ্টাটা লম্বায় কুড়ি ফুট সাত ইঞ্চি। ঘণ্টার পরিধি ২২ ফুট ৮ ইঞ্চি। অবশ্য এটা তৈরীও হয়েছিল অনেকদিন আগে সেই ১৭৩৩ সালে, এটা সোভিয়েট ইউনিয়নেই তৈরী হয়েছিল। অবশ্য এরপর সেদেশে আরো দুটি বড় ঘণ্টা তৈরী হয়েছে। একটার ওজন ১৭১ টন ও অন্যটার ওজন ১১০ টন।

না এতে অবাক হলে চলবে না। পৃথিবীতে ঘণ্টার কথা জানতে গেলে আরও একটু জানতে হবে। চীন দেশেও কিন্তু দুটো বড় ঘণ্টা আছে যা সেদেশের পূজা পার্বনে বাজানো হয়ে থাকে, তিপান্ন টন ওজনের একটা ঘণ্টা আছে রাজধানী বেজিং শহরে। অপর ঘণ্টাটা আছে নানকিং শহরে। এর ওজনটা ২২ টন। এসব ঘণ্টার আওয়াজ কত বেশী হতে পারে একবার ভেবে দেখা যেতে পারে। সেন্টপলস্ গীর্জায় যে ঘণ্টাটা আছে এদের তুলনায় সেটা নেহাৎই ছোট। ১৮৮১ সালে তৈরী এই ঘণ্টাটার ওজন মাত্র পৌনে ১৭ টন। ইংরাজী নববর্ষে রাত বারোটায় এই ঘণ্টার ধ্বনি আমাদের নতুন বছরের আগমনকে জানিয়ে দেয়।

সবচেয়ে বয়স্ক জীবিত পুরুষ :

পৃথিবীতে জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠ মানুষটি কে ? আপনারা জানেন কি ? না জানলে জেনে নিন। এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বয়স্ক জীবিত মানুষটি হলেন একজন পুরুষ মানুষ। এর নাম ইব্রাহিম এল কুত্তমি। ইনি থাকেন মিশরের সুয়েজ খালের কাছে আশিন গ্রামে। এখন তার বয়স মাত্র ১৬০ বছর। হ্যাঁ, এই বয়সে তাঁর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য দেখলে বোঝাই যাবে না তিনি অত বৃদ্ধ। অবশ্য বৃদ্ধ বলে তিনি নিজেকে মোটেই মনে করেন না। এখনো তিনি বেশ কর্মঠ। পৃথিবীর সবচেয়ে এই বয়স্ক মানুষটি কিন্তু খুব সরল। বিশেষ কোনো নেশা তাঁর নেই। তবে তিনি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মটাকে বেশ ভালভাবেই মেনে চলেন। বিশেষ রোগটোগ তাঁর শরীরে তাই নেই। অনেকে হয়তো জানতে চাইবেন তাঁর ছেলে মেয়ে বা নাতি-নাতনীর মোট সংখ্যা কত ? তার নাতি-নাতনী এবং তাদের ছেলেমেয়ের সংখ্যা ? মাত্র ৮৮ !

পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘজীবী মহিলা :

বর্তমান দশকে পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘজীবী মানুষ ছিলেন এক মহিলা। সেই মহিলার নাম মিসেস অ্যানা এলিজা উইলিয়ামস। হয়তো জানতে ইচ্ছে করছে ঐ ভদ্রমহিলার বয়স কত ? না বয়স খুব বেশি না হলেও মাত্র ১১৪ বছর ২০৯ দিন। তবে দুঃখের খবর ঐ বয়স্কা মহিলা ১৯৮৮ সালের ৩ জানুয়ারী মারা গেছেন। সনসেন দক্ষিণ ওয়েলসে তাঁর নিজের বাড়িতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। গত কয়েক মাস ধরে তিনি ঐ বাড়িতেই থাকতেন। গিনেস বুক ওব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে মিসেস উইলিয়ামসের নাম লেখা ছিল বর্তমানে জীবিতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়সী মানুষ হিসাবে। এর আগে ঐ স্থান অধিকার করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলি-

নয়ের নিবার্টিভিল্লের মিস্টার মামি কেথ। তিনি ১১৩ বছর বয়সে ১৯৮৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর মারা গিয়েছেন।

বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা পুরুষ ও মহিলা :

এ পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মানুষ জন্মেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নাম রবার্ট ওয়াডলো। তিনি জন্মেছিলেন ১৯১৮ সালে। মাত্র ২২ বছর বয়সে তার শরীরের উচ্চতা দাঁড়ায় ৮ ফুট ১১ ইঞ্চি। তবে দুর্ভাগ্য ওয়াডলোর, তিনি ২২ বছরের বেশি বাঁচেননি। মাত্র ৫ বছর বয়সেই ওয়াডলোর দেহের উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি।

মেয়েদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে লম্বা যিনি তার নাম সান চুংলিং। নাম শুনেই বুঝতে পারছেন ঐ মহিলা হলেন চীনা। চীনের মেয়েরা সাধারণত খর্বকায় অথচ সেই দেশেই জন্মেছেন বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা মহিলা। ১৯৬৪ সালে সান চুংলিং জন্ম গ্রহণ করেন। তার উচ্চতা ছিল ৮ ফুট ১ ইঞ্চি। ১৯৮২ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়েসে তাঁর দেহের ঐ উচ্চতা দাঁড়ায়। ১৮ বছর বয়সেই তিনি মারা যান। এখন বিশ্বে জীবিত পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা লোকটি কিন্তু অপ্রতিদ্বন্দ্বী নন। এর মধ্যে এক বছরের ছোট গ্যাব্রিয়েল মনজানের জন্ম ১৯৪৪ সালে। তার উচ্চতা ৮ ফুট। ঐ একই উচ্চতার অধিকারী সুলেমান নানজুসের জন্ম ১৯৪৩ সালে। এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে জীবিত মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা হলেন ক্যানাডার সাণ্ডি এলেন। তাঁর উচ্চতা হল ৭ ফুট সাড়ে ৭ ইঞ্চি। জন্ম ১৯৫৫ সালে।

টুথব্রাশ গেলার রেকর্ড :

টুথব্রাশ দিয়ে লোকে দাঁত মাজে। এই টুথব্রাশ গিলে ফেলার কথা শুনলে তাই কিছুটা আশ্চর্য্য হতে হয় বৈকি, পৃথিবীতে এ ধরনের ঘটনা কিন্তু বিরল নয়। ১৯৮৮সালের ঘটনার কথাই বলি।

ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ অ্যালান ডি, ক্লার্ক জানিয়েছেন যে, নর্থ ক্যারোলিনার চারজন টুথব্রাশ গিলে ফেলেছেন। এদের মধ্যে ৬০ বছর বয়স্কা এক বৃদ্ধা ছিলেন। তিনি দাঁত ব্রাশ করতে করতে টুথব্রাসটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন তার কণ্ঠনালীতে। ছোট টুথব্রাশ। তবুও তো তাঁর দম বন্ধ হবার জোগাড় হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ডাক পড়লো ডাক্তারের, শেষে মুখের মধ্যে ফর্‌সেফ্ ঢুকিয়ে বের করে আনা হল আটকে থাকা টুথব্রাশটি। কুড়ি বছর বয়স্কা আর একজন মহিলার কথা বলেছেন ডঃ ক্লার্ক। ঐ মহিলা দাঁত ব্রাশ করার সময় প্রচণ্ড কাশি হত আর তার ফলে বুকের যন্ত্রনায় ভুগতেন। শেষে একদিন দেখা গেল টুথব্রাশটা তিনি গিলে ফেলেছেন কোন অসতর্ক মূহুর্তে। ডাক্তাররা তার মুখের মধ্যে দিয়ে একটা তার ঢুকিয়ে বের করে আনলেন তার পাকস্থলীতে আটকে থাকা ব্রাশটা।

যে দুটি ঘটনার কথা বললাম তার সঙ্গে দুজন মহিলা জড়িত। কিন্তু তাই বলে ভাববেন না যে টুথব্রাশ গিলে ফেলার ক্ষেত্রে মহিলারাই পারদর্শী। না, পুরুষরাও কিন্তু কম যান না। নর্থ ক্যারোলিনারই দুজন মাদকাসক্ত অবস্থায় দাঁত মাজতে গিয়ে গোটা টুথব্রাশই গিলে ফেলেন। তবে মাত্র একটা বিশেষ জায়গার কথা বললেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। আমাদের দেশেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তবে টুথব্রাশ গিলে ফেলার ব্যাপারে সবাইকে টেক্কা দিয়ে হয়ত বিশ্বরেকর্ড করেছেন সোভিয়েট ইউনিয়নের এক মানসিক রোগী। একবার দুবার নয় তিনি ১৬ বার টুথব্রাশ গিলে ফেলেছেন এতবার সেটা গিলেছেন মাত্র এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৮৪ সালে। বিভিন্ন দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত পত্রপত্রিকা, অনুসন্ধান করে একদল গবেষক এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এ পর্যন্ত ৩১ জনের টুথব্রাশ গেলার খবর তারা পেয়েছেন।

চারশো শতায়ু ব্যক্তি :

এই সুন্দর পৃথিবীতে কেউ মরতে চায় না। মরতে না চাইলেও সব মানুষকে একদিন না একদিন মরতে হয়। এটাই প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। তবুও মানুষের আকুতি আরো কিছুদিন বাঁচতে দাও। কোন মানুষ অল্পদিনের মধ্যে মারা যান আবার কেউ কেউ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকেন। যাঁরা দীর্ঘদিন বাঁচেন তাঁরা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান। একশো বছরের ওপরে বেঁচে আছেন এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে খুবই কম। তাঁরা সৌভাগ্যবান একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এমন সৌভাগ্যবান মানুষের সংখ্যা ইউরোপের বালগেরিয়াতে সবচেয়ে বেশি। সেখানকার ৯০ লক্ষ মানুষের মধ্যে চারশো জনের বয়স এখন একশো বছরেরও বেশি। আর এই শতায়ু ব্যক্তিদের মধ্যে বেশির ভাগই বাস করেন সেখানকার পাহাড়ি অঞ্চলে। বহু সন্তান সন্ততি নিয়ে তাঁদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি। বড় পরিবার নিয়ে তাঁরা বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছেন। তাঁদের দীর্ঘজীবী হবার গোপন রহস্য হয়তো অনেকেই জানতে চাইছেন। এ সম্পর্কে সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তাঁরা জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটান খোলা আকাশের নিচে। কখনো তাঁরা অতিরিক্ত খাবার খান না, ধূমপান করেন না, এমনকী মদ্যপান পর্যন্ত করেন না।

আজব খাওয়া :

নানা ভোজনরসিকের কথা আমরা মাঝে মাঝেই শুনতে পাই। ক্যালিফোর্নিয়ার পিটার ডুক্সওয়েল এ পর্যন্ত দুধ, কেক, স্যাণ্ডইচ, আলু, কুচো চিংড়ি জেলি ইত্যাদি খেয়ে নানান রেকর্ড করেছেন। তবে একটা গোটা ষাঁড়ের রোস্ট খেয়ে জোহান কেটলার যে বিশ্বরেকর্ড করেছেন তা ভাঙা বোধহয় তার পক্ষেও সম্ভব হবে না। অবশ্য কেটলার একদিনেই ষাঁড়টা খাননি, খেয়েছেন ৪২ দিনে। মাত্র দু মিনিটে ১৭টা কলা খেয়ে বিশ্বরেকর্ড করেছেন রোনাল্ড

আলকানা। দশ মিনিটে দু কেজি মুরগির রোস্ট খেয়ে ভালেনতিন মুনোজ যে রেকর্ড করেছেন, তা ভাঙার জন্য কেউ এগিয়ে আসবেন কি? তবে শর্ত একটা—কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে তাঁদের সামনে মুরগির রোস্ট খাওয়ার এই রেকর্ডটা করতে হবে। কি পারবেন তো? পারলেই গিনিস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ নাম উঠবে। আজব খাওয়ার কথা শুধু বইতে নয়, বাস্তবেও পাওয়া যায়। ক্যানাডার এক মহিলার রাতদিন খাই খাই বাই ছিল। হাতের কাছে যা পেতেন মুখে পুরে দিতেন। এমনকি কাঁচের টুকরো, আলপিন কিছুই বাদ যেত না। অবশ্য এসব খাবার কথা তাঁর বাড়ির কেউ কোনদিন জানতে পারেননি। ১৯২৭ সালে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে একদিন ঐ ভদ্রমহিলার পেটে দারুণ যন্ত্রণা হতে লাগল। ভর্তি হলেন সেখানকার ওনটারিও হাসপাতালে। অপারেশন করে পেটের মধ্যে পাওয়া গেল ৯৪৭টা আলপিন সহ মোট ২ হাজার ৫ শো ৩৩টি জিনিস।

প্রাচীনতম মদিরা ঃ

কথায় বলে নতুন বোতলে পুরানো মদ। পুরনো মদ অনেক সময় খারাপ হয়ে যায় বলে শোনা গেছে। কিন্তু ৩ হাজার ২ শো বছরের পুরনো মদ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে, এমন কথা কি কোনোদিন চিন্তা করা যায়? চীনের হেনান অঞ্চলে খনন কার্য চালিয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদরা শাং রাজত্বকালের ব্রোঞ্জের তৈরি একটা পাত্রের সন্ধান পেয়েছেন। আর, ঐ পাত্রতেই মদ ভর্তি ছিল। এরকম বিরল মদিরা অবিকৃত রয়েছে, খবরটা অনেকের কাছে আশ্চর্যের বলে মনে হবে। এতদিন পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত মদিরাই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো মদিরা বলে চিহ্নিত ছিল। কিন্তু এখন এ ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হল। এখনও পর্যন্ত ঐ হেনান প্রদেশে প্রাপ্ত মদিরাই পৃথিবীর প্রাচীনতম বলে পরিগণিত

হল। সুতরাং বলতে পারা যায় মদের রেকড ভেঙে এবার নতুন রেকর্ড গড়ল হেনান প্রদেশের মদিরা। এখন ঐ মদিরা কি যাদুঘরে রাখা হবে? না, এখনও এ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তের কথা যানা যায়নি।

বিশ্বের সবচেয়ে সোনা বেশি ঃ-

নিউইয়র্কে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ৮০ ফুট নিচের একটি ঘরে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সোনা মজুত করা আছে। এই সোনার মূল্য ১১০ বিলিয়ন ডলারের মত। তবে এর মধ্যে খুব কম পরিমাণ সোনার মালিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পৃথিবীর প্রায় ৪০টি দেশের সম্পত্তি এই সোনা। তারা নিজেদের দেশের থেকে এখানে সোনা মজুত করে রাখাটা বেশি নিরাপদ বলে মনে করে, ঐ সব সোনা সবই বার বা দণ্ডের আকারে রাখা আছে। এর মোট সংখ্যা হল ৮৪ হাজারের কিছু বেশি। এই দণ্ডগুলিকে যদি লম্বাভাবে পরপর জোড়া দেওয়া যায় তবে ১৪ কিলোমিটার লম্বা হবে। এগুলোকে থরে থরে স্থাপন করলে এর উচ্চতা দাঁড়াবে ৩,৭৫০ মিটার। অর্থাৎ বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম বাড়ির চেয়ে ১১ ফুট বেশি উঁচু।

কনিষ্ঠতমা জননী ঃ

পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ জননী রূপে রেকর্ড করার অধিকারিণী হওয়াটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। আর এই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হয়েছেন ব্রাজিলের ৯ বছর বয়সের মেয়ে মারিয়া ইলায়নে জেসাস মাস কারেনাস। এ বছরের মার্চ মাসের শেষের দিকে সে একটি শিশুর জন্ম দিয়েছে। শিশুটি কন্যা সন্তান। আর শিশুটির পিতার বয়স কত জানেন? মাত্র ১৮ বছর। তিনি একজন কৃষি শ্রমিক। ন বছরের ঐ মেয়েটি কিন্তু হঠাৎ এই অবস্থার

জন্য প্রস্তুত ছিল না। বাচ্চা হওয়া কি জিনিস সে জানত না। তাই হঠাৎ প্রসব যন্ত্রণা ওঠবার পর কিছুটা কাতর হয়ে সে ছটফট করছিল। কিন্তু সন্তান প্রসবের পর সে রীতিমত ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে যায় কাছাকাছি একটা বনে। মা মরা মেয়ে মারিয়া ছোটবেলা থেকেই মানুষ হয়েছে এক বৃদ্ধ কৃষকের কাছে। সেই কৃষকের বয়স এখন ৬২ বছর। মারিয়া কিন্তু তার মাকে একেবারেই দেখেনি। কেননা তাঁর জন্মবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মা মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সর্বকনিষ্ঠা মা হিসাবে সে রীতিমত তার সন্তানকে মানুষ করে তুলছে। ব্রাজিলের ডেলি মিরার সংবাদ পত্রে খবরটা ছাপা হয়েছে।

বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠা জননী হবার কৃতিত্ব থেকে আর একটা মেয়ে অবশ্য অল্পের জন্য বঞ্চিত হয়েছে। নাইরোবিতে ১১ বছরের একটি মেয়ে সম্প্রতি একটা স্বাস্থ্যবান শিশুর জন্ম দিয়েছে। বয়সটা দুবছর বেশি হয়ে গেছে তাই সে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী হতে পারল না। বাইশ বছর বয়স্ক একজন সেলস্‌ম্যানের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল।

সবচেয়ে ছোট মানুষ :

জোনাথন সুইফটের লেখা 'গ্যালিভার্স ট্রাভেলস' বইতে আমরা লিলিপুটদের কথা পড়েছি। মেরুপ্রদেশের ছোট্ট ছোট্ট মানুষ পিগমিদের কথাও আমরা জানি। তবে পিগমিদের চেয়েও ছোট্ট মানুষ আমাদের পৃথিবীতে জন্মেছেন। এ ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী একজন তরুণী। নাম রাজকুমারী পলিন। ১৯ বছর বয়সে যখন তিনি মারা যান তখন তাঁর উচ্চতা ছিল মাত্র ২ ফুট। পুরুষদের মধ্যে বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী ২১ বছরের মার্কিনী তরুণ ক্যালভিন ফিলিপস। তাঁর উচ্চতা ছিল মাত্র ২ ফুট ২ ইঞ্চি। তিনি জন্মেছিলেন ১৭৯১ সালে, মারা যান ১৮১২ সালে।

বর্তমানে জীবিতদের মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট মানুষটির সন্ধান পাওয়া গেছে পর্তুগালে। তেতাল্লিশ বছর বয়স্ক এই মানুষটির নাম আন্তনিও ফেরেরা। উচ্চতা মাত্র আড়াই ফুট। তিনি ড্রাম বাজাতে বেশ ওস্তাদ।

ক্ষুদ্রতম বই :

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট বই এর মাপ কত জানেন? এক দশমিক চার মিলিমিটার। 'আওয়ার ফাদার' নামে প্রার্থনার এই বইটা তৈরি করেছেন জাপানীরা। এই বইটার মালিক হচ্ছেন যুগোশ্লোভিয়ার ডাঃ মার্টিন জিদেরসিক। তাঁর সংগ্রহে এই বইটি ছাড়াও প্রায় আটশো ছোট আকারের বই আছে। ছোট বই সংগ্রহ করাই হল তাঁর নেশা।

সবচেয়ে বড় ও ছোট বৌদ্ধমূর্তি :

ব্রোঞ্জের তৈরি সবচেয়ে বড় বৌদ্ধমূর্তি পৃথিবীর কোন দেশে আছে তা অনেকেই হয়ত বলতে পারবে না। সবচেয়ে বড় ব্রোঞ্জের বৌদ্ধমূর্তি আছে চীন দেশে। আর সবচেয়ে ছোট ব্রোঞ্জ মূর্তিটা কোথায় আছে? এটাও আছে ঐ চীনে। আর এই ক্ষুদ্রতম বৌদ্ধমূর্তিটার আকার? একটা তিলের বীজের মত। একজন চীনা কারিগর এক বছরের কম সময়ে ওটা তৈরি করেছেন। তবে হ্যাঁ, মূর্তিটা ভালভাবে দেখতে হলে অবশ্যই অনুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে দেখতে হবে।

বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম গীর্জা :

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় গীর্জাটা কোন্ দেশে অবস্থিত একথাটাও হয়ত আমরা অনেকে জানি না। রোমের ভ্যাটিকান সিটিতে অবস্থিত সেন্ট পিটার চার্চটা হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গীর্জা।

গীর্জাটার আয়তন হল এক লক্ষ বাষট্টি হাজার নশো কুড়ি বর্গফুট। এটির উচ্চতা ছশো এগারো ফুট চার ইঞ্চি। গীর্জাটি তৈরী করতে ১২০ বছরের মতো সময় লেগেছিল।

সবচেয়ে বড় ক্যাথিড্রাল বা উপাসনা গৃহটির নাম হল সেণ্ট জন ক্যাথিড্রাল। এটা আমেরিকার নিউইয়র্কে অবস্থিত। এর আয়তন একলক্ষ একুশ হাজার বর্গফুট। এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৮৯২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সালেও এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি। অবশ্য মাঝে কিছুদিন এর কাজ একেবারে বন্ধ ছিল।

এ তো গেল সবচেয়ে বড়র কথা। এবারে আসছি সবচেয়ে ছোটর কথায়। খ্রীষ্টানদের সবচেয়ে ছোট গীর্জাটা রয়েছে উইমজাসেটে। এটা দৈর্ঘ্যে সাত ফুট, আর প্রস্থে সাড়ে চার ফুটের মতো।

সবচেয়ে ছোট ক্যাথিড্রাল বা উপাসনা গৃহটি রয়েছে আমেরিকার ক্যালিফেলেগুণা বীচে। এর নাম ক্যাথিড্ডাটাপেল অফ সেণ্ট ফ্রান্সিস। মাত্র বিয়াল্লিশজন লোকের এখানে বসবার জায়গা আছে।

বিয়ের রেকর্ড ঃ

প্রাচীনকালে পুরুষদের বহু বিবাহের কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু কোনো লোক ২৭টা বিয়ে করেছেন—এরকম খবর সত্যি চমকপ্রদ। আর এই ২৭টা মেয়েকে বিয়ে করেছেন একালের এক ব্যায়ামবীর ভদ্রলোক। ক্যালিফোর্নিয়ার এই ভদ্রলোকের নাম গ্লিন স্কটি উল্‌ফ। বয়স ৭৬ বছর। একজন ব্যাটটিস্ট মন্ত্রী মিঃ উলফের সন্তানের সংখ্যা মাত্র ৪০। তিনি বিয়ের ব্যাপারে সত্যিই রেকর্ড করেছেন। ছাব্বিশতম বৌকে বিয়ে করার ৭ মাস পরে তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছে। তিনি তাঁর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে চেয়েছেন। কারণ তাঁর এই স্ত্রী নাকি বাড়িতে থাকতে চান না, আর কাপড় কাচতে চান না। সুতরাং এ হেন বৌকে তাঁর আর ভাল লাগছে না। মিঃ উলফের এই অভিযোগ থাকলে কি হবে যথার্থই তিনি রসিক—কেন না সাতাশতম বধূর উদ্দেশ্যে তাঁর অঙ্গীকার—সুখে রাখবো, নামজাদা মহিলা করে দেবো, আর হাতে তুলে দেবো নগদ ৫ লক্ষ ডলার। অবশ্য তাঁর সঙ্গে না পোষালে ভেগে পড়ার দরজাও নিশ্চয়ই খোলা থাকবে।

বিয়ের ব্যাপারে বোধ হয় সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন, ভারতের ওড়িশা রাজ্যের ওরলি গ্রামের ৬১ বছর বয়স্ক উদয়নাথ দখিনারায়। এরই মধ্যে তিনি ৮৮ বার বিয়ে করেছেন। বলতে গেলে বিয়ে করা তাঁর নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য তিনি বাহাদুর বটে, কেন না নিজেই একথা অকপটে স্বীকার করেছেন। বৌ ভাগ্য থাকলেও কিন্তু এর মধ্যে ৫৯ জন বৌ তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন, ২৪ জন মারা গেছেন, আর এখন তাঁর সঙ্গে রয়েছেন মাত্র ৫ জন

বৌ। না ভদ্রলোক তাই বলে বৌভাতের খরচ যোগানোর জন্য পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে কোনো পণটন নেন না। পণপ্রথার তিনি বিরোধী। এই বয়সে তিনি রোজ ৫০ কিলোমিটার সাইকেল চালান। তাঁর দৈহিক উচ্চতা ৬ ফুট।

শতায়ুর বিবাহ বাসনা :

অগ্নিসাক্ষী রেখে বিয়ে করে লোকে বৌকে ঘরে নিয়ে আসেন, তার সঙ্গে হেসে খেলে ঘর সংসার করেন, এটাই স্বাভাবিক। অবশ্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাটি যে হয় না এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। বেশির ভাগ লোকই একটি বৌ নিয়ে ঘর সংসার করেন। অনেককে বলতে শোনা যায়, একটা বিয়ে করেই হিমসিম খাচ্ছি, মরলেও আর ছাদনাতলায় যাব না!

এরই পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই এক একজনকে বিয়ের নেশায় পেয়ে বসেছে। কেউ বা আবার বিয়ের ব্যাপারে বিশ্ব রেকর্ডও করেছেন। বিয়ে করে মেয়েদের প্রতারণা করতে গিয়ে কোন কোন লোককে শ্রীঘরে যেতে হয়। কিন্তু একশো বছর বয়েসী লোক যদি বিয়ে করতে যান তবে আশ্চর্য হবেন না কি? উত্তরপ্রদেশের কানপুরের কাছে ঘটমপুর গ্রামে ১০০ বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধ তাঁর ১৩ নম্বর বিয়েটা একরকম পাকাই করে ফেলেছিলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন তাঁর ১২ নম্বর পত্নী ও ছেলেমেয়েরা। সুতরাং অনন্তযৌবন শতায়ু বরের আর বিয়ে করা হল না। মনের সাধ মনেই রইল।

বৃদ্ধস্য (১৩০) তরুণী (৩০) ভার্যা :

এক স্বামী-স্ত্রী সমাচার। এই স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য একশো বছর। হ্যাঁ পাকিস্তানের হাফিজ গোলাম কাদির সত্যিই রেকর্ড করেছেন। ১৩০ বছর বয়সে তিনি তৃতীয়বার বিয়ে

করেছেন। আর তাঁর এই তৃতীয় বিবিজানের বয়স মাত্র তিরিশ বছর। ভদ্রলোক রসিক বটে! আর মিস্টার কাদিরের বড় ছেলের বয়স কত জানেন? নব্বই বছর। ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী নিয়ে মিস্টার কাদিরের পরিবারের সদস্যসংখ্যা একশো। জাপানের মিস্টার শিগেচিও ইজুমীকে গিনিস বুক অফ রেকর্ডসে বর্তমান পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সবচেয়ে বয়স্ক লোক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মিস্টার ইজুমীর বয়স ১১৯ বছর। সেই দিক থেকে মিস্টার কাদির এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে বয়স্ক লোক হিসাবে দাবী করতে পারেন।

কনের বয়স ২১ দিন ঃ

মানুষের কুসংস্কার মাঝে মাঝে কত বিচিত্র ঘটনার সৃষ্টি করে তা ভাবলে সত্যি বিস্মিত হতে হয়। আর এই বিস্ময়কর ঘটনাগুলির মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক আছে বলে যেন মনে হয় না। নিছক অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই মানুষ এইসব কাজ করে থাকে। তা না হলে মাত্র ২১ দিনের মেয়ের বিয়ে দেবার ঘটনা ঘটত না। কী, ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে আসল কথায় আসি। বাংলাদেশের যশোহর জেলার নারকেলবাড়ি গ্রামে এই বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। ঐ ২১ দিনের শিশুকন্যার বিয়ে দেওয়া হয়েছে ১৭ বছরের বয়েসি বরের সঙ্গে। মেয়ের বাবা হরেন দাস নিজেই কন্যাদান-পর্ব সম্পন্ন করেছেন।

ভদ্রলোকের আগের তিনটি সন্তান জন্মের পর পরই মারা গেছে। তাই এই চতুর্থ সন্তান হবার পর তিনি শরণাপন্ন হলেন এক সাধু বাবাজীর কাছে। সাধু বাবা নানারকম গণনা করে বিধান দিলেন—ঐ কন্যাসন্তানের ওপর স্বর্গের দেবতার অভিশাপ রয়েছে। সুতরাং দেবতার রোষ কাটাতে হলে এখুনি মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। এই বিয়ে না দিলে মেয়েকে বাঁচানো অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত

কন্যার পিতা অনেক কষ্টে খুঁজে-পেতে সন্ধান পেলেন এক কিশোরের। ঐ কিশোরের অভিভাবকদের সম্মতি মিলল। বিয়ে হয়ে গেল ২১ দিনের মেয়ের সঙ্গে ১৭ বছরের কিশোরের। অনেকটা খেলাঘরের পুতুলের বিয়ের মত। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'বাংলাবাণী' সংবাদপত্রে খবরটা ছাপা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু তা হলে কী হবে, কুসংস্কারের ফলে সেখানে বাল্য-বিবাহের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

জেলখানায় বিয়ে :

জেলখানাতে কয়েদীরা কারাদণ্ড ভোগ করে একথা আমরা জানি, কিন্তু জেলখানাতে বিয়ের অনুষ্ঠান করার কথা কেউ ভেবেছেন কি ? হ্যাঁ, একজন চীনা তিন বছর জেল খেটে ছাড়া পাবার পর জেলকে বড্ড বেশি ভালবেসে ফেলেছেন। একটি অপরাধের জন্য সাংহাই জেলে তিন বছর বন্দী থাকার পর গত ১৯৮১ সালে জিন চেং নামে ৩৩ বছর বয়স্ক ঐ লোকটিকে মুক্তি দেওয়া হয়। তারপর চেং-এর বিয়ে ঠিক হল। কিন্তু না, তিনি সাধারণ ভাবে বিয়ে করবেন না, বিয়ে যদি করতেই হয়, তবে অনুষ্ঠানটা করতে হবে ঐ জেলের মধ্যে। কেন না ঐ জেলই তাঁকে নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাই হল। জেলের ভেতর বিয়ে হল।

অষ্ট্রেলিয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বেশী :

অষ্ট্রেলিয়ায় বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেছে। এখানে শতকরা ৪০ ভাগ দম্পতির দাম্পত্য জীবন শেষ হয় বিবাহ-বিচ্ছেদের মাধ্যমে। বিবাহ-বিচ্ছেদের বৈধ আইনের সাহায্য না নিয়েই বহু দম্পতি এখানে বিবাহিত জীবনের ছেদ টেনে দেন।

অষ্ট্রেলিয়ায় বহু দম্পতির স্কুলে পড়া সন্তানেরাও এই কারণে খুবই উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটায়। কি জানি কখন তাদের বাবা মায়ের আলাদা হয়ে যান।

ব্যাপারটা খুবই চিন্তার বিষয়। এখানে ১৮৭৬ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত মোট ৮,৩০,৭৭৩ জন শিশু সন্তানের পাওয়া গেছে। যাদের বাবা-মায়েরা বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আলাদা বসবাস করেছেন।

কম্পিউটার-ঘটক ঃ

চীনে কম্পিউটারে ঘটকালি শুরু হয়ে গেছে। রাজধানী বেজিং-এর তিয়ানামেন স্কোয়ারে ১৯৮৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে চলে আসছে এই কম্পিউটার ঘটকের ঘটকালি। জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীর খোঁজে এখন এই যন্ত্র ঘটকের কাছে যুবক-যুবতীদের লম্বা লাইন। ইতিমধ্যে এই ঘটক-যন্ত্রে নাম লিখিয়েছেন ৭১ হাজারের বেশি ছেলেমেয়ে। প্রতি রবিবার বসে ঘটকালির আসর। এলাম, পয়সা দিলাম আর উপযুক্ত সঙ্গী বা সঙ্গিনী নিয়ে চলে গেলাম তা কিন্তু নয়। আগে থেকে পাত্র বা পাত্রীর নাম, ঠিকানা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, চাকরি, রোজগার, পারিবারিক অবস্থা সব কিছু জানাতে হবে। এইভাবে যাঁদের নাম নথিভুক্ত থাকে কম্পিউটার ঘটক তাদেরই কেবল সহায়তা দেয়। যন্ত্র-ঘটক ঠিক করে দেয় উপযুক্ত সঙ্গী বা সঙ্গিনী। এরই মধ্যে কম্পিউটার ঘটকের ঘটকালির কল্যাণে বিয়ে করে সাড়ে তিনশো দম্পতি সুখেই ঘর সংসার করছেন। তবে যাঁরা আগেই বিয়ে করে ফেলেছেন তাঁরা যেন যন্ত্র-ঘটকের কাছে তাদের উপযুক্ততা যাচাই করতে যাবেন না। বলা তো যায় না, যন্ত্র-ঘটক সবকিছু যাচাই করে যদি ঘর ভাঙার পরামর্শ দেয়, তাহলে!

অর্ধশতের জননী ঃ

চিলির মিসেস লিওমতিনা আলবিনা 'মাতৃত্বের গরবে গরবিনী'। গর্ব করার ব্যাপারই বটে! কেননা ৬২ বছর বয়সে তিনি মোট ৫৫টি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। ১৯৮১ সালে তাঁর শেষ, অর্থাৎ ৫৫তম সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। সত্যবানের মরদেহ নিতে এলে সাবিত্রী যমরাজের কাছে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলেন। পরিবর্তে যমরাজ তাঁকে বর দিয়েছিলেন তুমি শতপুত্রের জননী হও। কিন্তু সাবিত্রী প্রশ্ন করেছিলেন আমার স্বামীর প্রাণ না ফিরিয়ে দিলে, আমি শতপুত্রের জননী হবো কী করে? শেষ পর্যন্ত যমরাজকে সত্যবানের জীবন ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল। সতী সাবিত্রী পরে শতপুত্রের জননী হয়েছিলেন কিনা জানা যায়নি। কিন্তু চিলির ঐ মহিলা মিসেস আলবিনা সত্যি সত্যিই শত সন্তানের জননী হতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, অন্তত একশোটা সন্তান থাকলে তিনি খুশি হতেন। তাঁর পতি দেবতাটির নাম জেরার্ডো। তাঁদের ১৫টি ছেলেমেয়ে মারা গেছে এর মধ্যে ভূমিকম্পে ১১টি। এখন তাঁদের জীবিত সন্তানের সংখ্যা মাত্র ৪০।

সত্তর সন্তানের জনক ঃ

পাকিস্তানের হাসান মহম্মদ ৬৫ বছর বয়সে ৭০টা ছেলেমেয়ের জনক হয়েছেন। বছরে গড়ে একটা করে সন্তান হলেও এই বয়সে এতগুলো ছেলেমেয়ের হিসাব মেলাতে গিয়ে অনেকেরই গোলমাল হয়ে যেতে পারে। অনেকে হয়ত এরপর প্রশ্ন করবেন হাসান মহম্মদ কটা বিয়ে করেছেন? মাত্র পাঁচটা। ১৯৪৭ সালে তিনি দুবার বিয়ে করেন। কিন্তু কপাল মন্দ। তাই তার সেই দুই বিবি কোনো সন্তানের জন্ম না দিয়েই মারা গেছেন। এর পরবর্তী জীবনে তিনি তিনটে সাদী করেছেন। তার তিন বিবিই ঐ ৭০টা ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েছেন। অবশ্য এর মধ্যে ১৩টা ছেলে আর

৫টা মেয়ে মারা গেছে। তার পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায় দেড়শো। সবাইকে নিয়ে যদি কোন নেমন্তন্ন বাড়ী যেতে হয় তবে দুটো বাস তো রিজার্ভ করতে হবে। এখনকার বাজারে অবশ্য কোনো আত্মীয় স্বজন তাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করতে নিশ্চই ভয় পাবে। তাদেরও উৎসব অনুষ্ঠানে বাইরের লোককে আর নেমন্তন্ন করতে হবে না। বাড়ীতেই যদি সকলে একসঙ্গে থাকে তবে উৎসব বাড়ী হবে জমজমাট। পাল অধিকৃত কাশ্মীরের পুচ জেলার নারিয়া শরীফ গ্রামের বাসিন্দা হাসান মহম্মদের ৬টা ছেলে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতে চাকরী করেন, দুই ছেলে বসবাস করছেন সৌদি আরবে, চার ছেলে হয়েছেন স্বর্ণকার এবং ১৬টা ছেলে এখনো পড়াশুনা করছেন।

এতো গেল ছেলেদের হিসাব, তার মেয়েদের মধ্যে ১৩টা মেয়ের সাদী হয়ে গেছে, ১৩ জন এখনো পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছেন আর একটা মেয়ে এখনো একেবারেই শিশু।

এতগুলো ছেলেমেয়ের নাম দেওয়া এবং তাদের হিসাব রাখাটা কম কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। জানিনা হাসান মহম্মদের এই বৃদ্ধ বয়সে ছেলেমেয়েদের হিসাব বা নাম গণ্ডগোল হয়ে যায় কিনা।

অবশ্য হাসান মহম্মদ এতে কিন্তু মোটেই বিচলিত নন। তিনি আরো সন্তানের জনক হতে চান। তার বক্তব্য—সন্তানের জন্ম দেবার পক্ষে বয়সটা কোনো বাধা নয়। সত্যি কৃতী পুরুষ বটে।

১৯৮৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী ইসলামাবাদ থেকে এই খবরটা পাওয়া গেছে।

একসঙ্গে সাত সন্তানের জন্ম ঃ

মহিলাদের যমজ সন্তানের জন্ম দেওয়াটা এখন আর কোন বিরল ঘটনা নয়। এমনকি এখন কোনো মহিলা এক সঙ্গে তিনটি বা চারটি সন্তানের জন্ম দিলেও তা আমাদের কাছে বিশেষ চাঞ্চল্যকর

খবর বলে পরিগণিত হয় না। যতই দিন যাচ্ছে ততই পৃথিবীর অনেক কিছু বদলাচ্ছে। প্রকৃতির নিয়মও বদলে যাচ্ছে। এখন মেয়েদের কাছে না শুধু মেয়েদের কাছে বলি কেন সব মানুষের কাছে বড় খবর হল একসঙ্গে সাত সাতটি সন্তানের জন্ম দেওয়া। গুজরাটের রাজকোট জেলার পার্বতীর কাছে সারিঙ্গপুর গ্রামে এক গৃহবধূ একসঙ্গে সাতটি সন্তানের জন্ম দিয়ে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন, এই সাতটি সন্তানের মধ্যে পাচটি পুত্র ও দুটি কন্যা। ১৯৮৮ সালের জুন মাসের গোড়ার দিকে তিনি এই বিরল কৃতিত্বের অধিকারিণী হয়েছেন। অবশ্য গ্রামাঞ্চলের মহিলা বলে আধুনিক কোন হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে তাঁর সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা হয়নি। পাশের গ্রামের এক দাই এসে সাফল্যের সঙ্গে তাকে প্রসব করান। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে যে মা ও সন্তানরা ভালই আছেন। তারা সবাই বেঁচে বর্ত্তে থাকুন আমরা সেইটাই চাই।

সুন্দরী বিদ্বেষ ? ঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীর সৌন্দর্য নিয়ে মানুষের গবেষনার অন্ত নেই। সুন্দরীদের দুচোখ মেলে দেখতে কোন পুরুষ না ভালবাসেন ? সেই প্রাচীন কাল থেকে কবিরা সুন্দরী নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন তাদের কবিতায়। আধুনিক কালে অনেক দেশেই সুন্দরী প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। হয়ে থাকে দেশের সেরা সুন্দরী প্রতিযোগিতা, এমনকি বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতাও। সুন্দরী প্রতিযোগিতায় বিজয়িনীরা নিশ্চয়ই মনে মনে গর্ব অনুভব করে থাকেন। এমনি এক প্রতিযোগিতা ১৯৮৮ সালের জুন মাসের গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো চীনের রাজধানী বেজিং-এ। মাসখানেকের ওপর সময় নিয়ে প্রাথমিক নির্বাচন হচ্ছিলো সুন্দরী প্রতিযোগিতার সুন্দরীদের। আটশোর বেশী সুন্দরী নাম দিয়েছিলেন সেই মিস বেজিং প্রতিযোগিতায়। বাছাই এর পর ঐ সংখ্যা

নেমে এসে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৪০এ। এরা সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন কার ভাগ্যে বেজিং সুন্দরীর বিজয়মাল্য জোটে। কিন্তু সে ভাগ্য আর কারো হল না। বাদ সাধলেন চীনা কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ। ফতোয়া জারী করা হল বিউটি কনটেস্ট বাতিল। তাদের মতে চীনের মত গরীব দেশে নাকি ওসব বিলাসবহুল বিউটি কনটেষ্ট অর্থাৎ সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা মোটেই মানায় না। সুতরাং ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চীনা সুন্দরীরা এখন যে যার ঘরে বসে হয়ত চোখের জল ফেলছেন। হয়ত তারা বলছেন—'চোখের আলোয় দেখছিলেন চোখের বাহিরে'। আর বেচারা চীনা পুরুষেরা সুন্দরী ললনাদের একবার চোখের দেখা থেকে বঞ্চিত হলেন! ১৯৪৯ সালের পর সেদেশে এই প্রথম বাদ সাধলেন সেখানকার কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ। সত্যি কি বেরসিক বলুন তো? অতঃপর সে দেশের সুন্দরীরা রোষে ফেটে পড়ছেন কিনা তা জানা যায়নি। তা হলে হয়ত ফতোয়া জারী করা চীনা নয়করা বলতেন, সুন্দরী গো, দোহাই দোহাই মান কোরো না। শেষ পর্যন্ত হয়ত চলতো তাদের মান ভাঙানোর পালা। তবে এখনো পর্যন্ত সেরকম কোন খবর পাওয়া যায়নি। সুতরাং কোন আশার বাণী আপনাদের শোনাতে পারছিনা। এর জন্য দুঃখিত।

বৈদ্যুতিক মহিলা ঃ

এক মহিলার শরীরে বেশ কিছু পরিমাণ বিদ্যুৎ আপনা থেকে জন্মাচ্ছে এবং সেই মহিলা কোনো তড়িতাহিত উৎসের কাছে আসছেন তখন হাতের আঙুলের ওপর প্রায় তিন ইঞ্চি বৈদ্যুতিক ফুলকি ছড়িয়ে পড়ছে। ব্যাপার সত্যিই আশ্চর্যজনক। লণ্ডনের ৪৬ বছর বয়স্কা এক গৃহবধূর শরীরে এই আশ্চর্যজনক ঘটনা রীতিমত সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। পাউলিন শ নামে ঐ ভদ্রমহিলা তিন পুত্র সন্তানের জননী। বরাবর কিন্তু তার এই

আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল না। ছ বছর আগে তার পিতার মৃত্যু ঘটলে তিনি প্রচণ্ড শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। সেই সময়ই তিনি লক্ষ্য করলেন যে তিনি প্রচণ্ডভাবে বিদ্যুৎতাড়িত হচ্ছেন। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে, মিসেস শ তার বাড়ীতে অ্যাকোরিয়ামের থার্মোষ্টার্ট ছুঁলেই অ্যাকোরিয়ামের জল প্রচণ্ড গরম হয়ে মাছগুলো সব সেদ্ধ হয়ে যায়। তিনি কম্পিউটারের কাছে গেলেই কম্পিউটার যায় বন্ধ হয়ে। জামা কাপড় কাচার মেসিনে হাত দিলেই অর্থাৎ ব্যবহার করতে গেলেই তার যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে যায় আর ফিউজ জ্বলে গলে যায়। মহিলা খুবই মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। অথচ এ ব্যাপারে তার কিছু করার নেই। একটা হিসাবে জানা গেছে যে, ১৯৮৮ সালের মে মাসের মধ্যে তার হাতের স্পর্শে দশটা কাপড় কাঁচার মেসিন (ওয়াসিং মেসিন) আড়াইশো বৈদ্যুতিক বাল্ব, বারোটা টেলিভিশান, বারোটা রেডিও, আঠারোটা টোস্টার, পনেরোটা কেটলি নষ্ট হয়ে গেছে। এসবের মোট খতির পরিমান ৮ হাজার পাউণ্ডের মত। অনেক ডাক্তার দেখিয়েও তাতে কোনো ফল হয়নি। তবে তিনি দিনে দু তিনবার ঠাণ্ডা জলে স্নান করেন তবে তাঁর শরীরে বিদ্যুতের মাত্রা কমে। এইটাই যা আশার কথা।

নারী মদ্যপায়ী :

পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মেয়েরা মদ্যপান করছেন-এ দৃশ্যটা দেখলে মনে কেমন যেন খট্‌কা লাগে। জাপানে কিন্তু গত দশ বছরে নারী মদ্যপায়ীর সংখ্যা তিনগুণ বেড়ে গেছে। সে দেশে 'হেসেলে'র এই মদ্যপান রীতিমত চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক দশক আগে জাপানে মদ্যপানের হারটা ছিল তিরিশ জন পুরুষ পিছু একজন মহিলা। কিন্তু এখন এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দশজন পুরুষ পিছু একজন মহিলা। নারীদের এই মদ্যপান বলতে

গেলে সেখানে একরকম পারিবারিক রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের উপায়ও অবশ্য বাতলানো হয়েছে। সমাধানের উপায় হলো স্বামীদের ভালবাসা ও বোঝাপড়ার মনোভাব। হয়ত এর অভাবের জন্য সেখানে মেয়েদের মাদকাসক্ত হতে দেখা যাচ্ছে। পুরুষদের চেয়ে নারী মদ্যপায়ীদের মাদকাসক্ত হতে কম সময় লাগে। জাপানের একিয়া ক্লিনিক অফ-সাইকিয়াট্রির অধিকর্তা ডাঃ সেফিয়ার দেওয়া তথ্য থেকে এটা জানা গেছে। তিনি মহিলাদের মাদকাসক্তি সম্পর্কে তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত একটা বই-এ এই তথ্য দিয়েছেন।

গোয়েন্দাগিরিতে মহিলা :

মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অনেক বিষয়ে অগ্রণী। গোয়েন্দা-গিরিতেও কিন্তু মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী। কেননা তাঁরা কোন কিছুর ওপর গুরুত্ব দিতে পারেন এবং কোন কিছু গোপন করার ব্যাপারে তাঁদের জুড়ি নেই। একজন মহিলা ঔপন্যাসিক কয়েকটি গোয়েন্দা কাহিনী লেখার সময় ইস্রাইলী মহিলাদের বুদ্ধির ওপর পড়াশুনা করে এই ধারণায় পৌঁছেছেন। তিনি বলেছেন, মহিলা গুপ্তচররা খুব একটা খারাপ হয়না। একজন পুরুষের চেয়ে একজন মহিলা এ ব্যাপারে অনেক বেশি নির্ভরশীল হয়ে থাকে। ঐ মহিলা ঔপন্যাসিক মিস কেইসার বলেছেন যে, ইস্রাইলে ও বিভিন্ন স্থানে তিনি গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে, জাতীয়তাবাদের ওপর যে মহিলার শ্রদ্ধা নেই তারই বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রের কাজে লিপ্ত হতে পারে।

বিচিত্র এক প্রথা :

যে সমস্ত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে খুব ভাব আছে কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারেন না তাঁদেরও পাশাপাশি নৌকাতে বসতে দেওয়া

হয় না নদী পারাপারের সময়। শুধু পাশাপাশি বসতে দেওয়াই নয় নৌকায় চড়ে স্ত্রীরা নদী পারাপার করতে পারে না। ভাবছেন এ কি বিচিত্র প্রথা রে বাবা। হ্যাঁ, এমন বিচিত্র সামাজিক প্রথা চালু আছে আফ্রিকার সারি নদীর ধারে বসবাসকারী নিগ্রোদের মধ্যে। স্বামীরা নৌকা করে নদী পার হবেন, কিন্তু স্ত্রীদের নদী পার হতে হয় পায়ে হেঁটে। তাই অনেক সময় স্বামীদের সঙ্গে স্ত্রীদের বের হওয়া হয়ে ওঠে না। আর এই প্রথা ভাঙা চলবে না। ভাঙলেই সেইসব স্ত্রীকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হবে। হায় রে বেচারা স্ত্রীরা !

আজব গাছ

মানুষখেকো গাছ ঃ

মানুষখেকো মানুষের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। গাছও কিন্তু মানুষ খায় এরকম আশ্চর্য ঘটনার কথা জানা না থাকলে কেউ ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে চাইবেন না। আসলে গাছ মানুষের অনেক উপকারে লাগে। মাদাগাস্কারে আনারস গাছের মত দেখতে এক ধরনের মানুষখেকো গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই গাছের কাণ্ড দশ ফুট উঁচু একটা পিপের মত। গাছের মাথা থেকে ১২ ফুট লম্বা আর এক ফুট চওড়া আটটা পাতা ক্রমশ সরু সূঁচের মত হয়ে মাটির দিকে ঝুলে পড়ে থাকে। দেখে মনে হবে গাছগুলো খুব নিরীহ। কিন্তু এই নিরীহ ছদ্মবেশের আড়ালে তাদের হিংস্র রূপটা লুকিয়ে থাকে। গাছের পাতায় থাকে বিষাক্ত এক ধরনের কাঁটা। কোন মানুষ ঐ গাছের কাছে এলেই পাতাগুলো দিয়ে মানুষটাকে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরে বিষাক্ত কাঁটাগুলো বিঁধিয়ে দেয় তার শরীরে। বিষে মৃত মানুষকে গাছটি অচিরেই পাতা দিয়ে ঢেকে অদৃশ্য করে দেয়। তারপর চলে গাছের আজব খাওয়া। একেবারে নরমাংস হজম। ব্যাপারটা খুবই ভয়ঙ্কর বলে মনে হবে নিশ্চয়ই।

শুধু মানুষ খাওয়া নয় আমাদের এই পৃথিবীতে আরো অনেক ধরনের রাক্ষুসে গাছ আছে যাদের কথা শুনলে শিউরে উঠতে হয়। কীটপতঙ্গ আর পোকামাকড় খেয়েই এইসব গাছ বেঁচে থাকে। ভারতের গারো পাহাড়ের স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় নেপেন্থাস নামে এক ধরনের গাছ আছে। বাংলায় এদের বলে কলস বৃক্ষ। এইসব গাছের পাতা দেখতে অনেকটা কলসীর মত। আর এই কলসীর মত পাতার ওপরে থাকে একটা ঢাকনা। কোন কীটপতঙ্গ খাবারের

সন্ধানে খোলা কলসীর কানায় এসে বসলেই পা পিছলে পড়ে যায় কলসীর ভেতরে। কিছুক্ষণের মধ্যে ছটফট করে তার মৃত্যু ঘটে। গাছ খায় সেই কীটপতঙ্গ। মাংসাশী বা রাক্ষুসে গাছ হিসাবে পরিচিত আর এক ধরনের গাছের নাম ভেনাস ফ্যাইট্রাপ। এই ধরনের গাছের পাতার দুধারে থাকে করাতের মত ধারালো দাঁত। পাতার ওপর যদি কোন কীটপতঙ্গ এসে বসে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে পাতা গুটিয়ে গাছ ওই পোকামাকড়কে ভেতরে টেনে নেয়। কাঁটার মত পাতার দাঁতের ফাঁকে পিষ্ট হয়ে কীটপতঙ্গের জীবনাবসান ঘটে।

সানডিউ নামে আর এক ধরনের গাছ দেখতে পাওয়া যায় পাহাড়ী আঞ্চলে। লাল টুকটুকে এই গাছের অপরূপ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কোন কীটপতঙ্গ পাতার ওপরে এসে বসলেই পাতার লম্বা লম্বা সুক্ষ্ম কাঁটা আর চটচটে আঠায় আটকে তার জীবন যায়। কাঁটাগুলো দিয়ে গাছের পাতা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরে মেরে ফেলে। এ এক বিচিত্র ব্যাপার।

জলাশয়ে, এমনকি নালার মধ্যে এক ধরনের গাছের সর্বাঙ্গে ছোট ছোট থলে থাকে। এই গাছের বেশিরভাগ অংশ জলের মধ্যে ডুবে থাকে। কোন ছোট কীটপতঙ্গ বা ছোট মাছ ভাসতে ভাসতে এসে থলের মুখে ধাক্কা দিলে মুখ খুলে যায়, আর কীটপতঙ্গ বা ছোট মাছ সোজা ঢুকে যায় থলের ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে থলের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। শ্বাস বন্ধ হয়ে সেই কীটপতঙ্গ বা মাছের মৃত্যু ঘটে। গাছ খায় তাদের মাংস। আরো নানা ধরনের মাংসাশী গাছ আছে আমাদের এই পৃথিবীতে। বিচিত্র তাদের আচার আচরণ।

গাছের বয়স আট হাজার বছর?

দুশো কি তিনশো বছরের পুরনো বটগাছের কথা আমরা শুনে থাকি। হাওড়ার শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে এ ধরনের প্রাচীন বটগাছ অনেক দর্শকের কাছেই রীতিমত আকর্ষণীয়। কিন্তু একটা

গাছ ৪ হাজার ৯ শো বছর বেঁচেছে এমন কথা বোধ হয় কেউ জানেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেভেদায় একটা পাইন গাছ ঐ ৪ হাজার ৯ শো বছর বেঁচেছে। আরো ক'বছর বাঁচত তা বলা যায় না। কিন্তু ১৯৬৪ সালে সেই গাছটাকে কাটা হল। গাছের গুঁড়িটা থেকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা অর্থাৎ বার্ষিক চক্র দেখে জানা গেল গাছটা অতদিন ধরে বেঁচে ছিল। সাধারণত একটা গাছ যত বছর বাঁচে তার গুঁড়িতে ততগুলি বর্ষচক্র থাকে। এইসব রিং বা চক্রের ব্যাস, মাপ, আকৃতি প্রভৃতি দেখে বৃক্ষ সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞরা অনায়াসে বলে দিতে পারেন সেই অঞ্চলের জলবায়ুর কথা। এমনকী ঐ বর্ষচক্র দেখে বলা যায় সেই জায়গায় কোন বছর বেশি বৃষ্টি হয়েছিল এবং কোন বছর খরা হয়েছিল। গাছের গুঁড়ির এই বর্ষচক্র দেখে যাঁরা গাছের বয়স নির্ধারণ করেন তাঁদের ইংরেজিতে বলা হয় ডেনড্রোকোলজিষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এইসব বৃক্ষ বিশেষজ্ঞরা সম্প্রতি কয়েক ধরনের মৃত পাইন গাছের গুঁড়ি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এর কোন কোনটি ৮ হাজার বছর পর্যন্ত বেঁচেছে।

গাছের জীবন তৃষ্ণা :

ছোট এক রকমের গাছ আছে তার নাম সোলডানেলা। এরা আলোক সংগ্রহের জন্য বরফের ভেতর দিয়ে নিজেদের পথ তৈরি করে নিতে পারে। বসন্তকালে এর গোল-গোল পাতাগুলো সবুজ থাকে, তখন ফুল আর কুঁড়ি থাকে গাছগুলোতে। শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে ফুল এবং বীজ অদৃশ্য হয়। তবে শীতের আগেই ওরা প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য পাতায় সঞ্চিত করে। কাজেই শীতের সময় পাতাগুলো বেশ ভারি আর মোটা হয়ে ওঠে। শীতের সময় গাছগুলো বরফের নিচে চাপা পড়ে যায়। কিন্তু ওদের আলোর তৃষ্ণা এতই প্রবল যে, বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে ওদের

ঘণ্টাকৃতির সুন্দর ফুলগুলো বরফের ভেতর দিয়েই ধীরে ধীরে ওপরের দিকে ওঠে—খোলা হাওয়ায় মাথা তোলে। অবশ্য পাতা থেকে প্রয়োজন মত উত্তাপ পায় বলেই এই বিদ্রোহ সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে কিন্তু ওদের পাতাগুলো আবার হালকা ফিনফিনে হয়ে যায়। তার কারণ সারাটা শীতকাল পাতায় জমানো খাবার খেয়েই ওরা বেঁচে ছিলো কিনা—তাই।......

শিংওয়ালা জীবন্ত ফল ঃ

বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রমাণ করেছিলেন যে গাছের প্রাণ আছে। গাছের যে প্রাণ আছে তা এখন হয়ত কারো মনে সন্দেহ নেই, পৃথিবীতে যেমন অনেক ধরনের প্রাণী আছে, তেমনি আছে নানান ধরনের গাছ। লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করামাত্র পাতা নুইয়ে পড়ে লজ্জায়। পোকামাকড় শিকারী কলসপত্রী গাছের কথা আমরা জানি। এর চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার হল কোনো গাছের ফল তার শিং দিয়ে বন্য প্রাণীদের আঘাত করছে! গরু, ছাগল, হরিণ, ভেড়া প্রভৃতি জন্তুর শিং আছে আমরা জানি, কিন্তু কোনো ফলের শিং থাকার কথা এ যাবত আমরা অনেকেই শুনিনি। অথচ ভাবতে অবাক লাগে যে দক্ষিণ আমেরিকার বনাঞ্চলে এক ধরনের ফলের গাছ আছে যার ফলের মাথায় আছে দুটি তীক্ষ্ণ শিং। অবশ্যই পশুর শিং-এর মত। ডেভিলস হর্ন, যার বাংলা করলে দাঁড়ায় শয়তানের শিং নামে এই ফলগুলি কাছাকাছি হঠাৎ কোনো বন্য প্রাণী এসে পড়লে ফলগুলি শিং দিয়ে তাদের আঘাত করে।

এটা তো গেল শিংওয়ালা ফলের কথা। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে পেপেরও শিং হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের আড়িয়াদহে ডি. ডি. মণ্ডল ঘাট রোডে এক ভদ্রলোকের বাড়ীর পেঁপে গাছে পেঁপে ফলেছে যা দেখতে অবিকল ছাগলের

মুখের মত। কপালের শিরা যেমন, তেমনি আছে ছাগলের মত পেঁপের মাথায় দু পাশে শিং। স্থানীয় লোকেদের কাছে ঐ ভদ্রলোক মাষ্টার নামে পরিচিত। এ হেন মাষ্টারমশাইয়ের বাগানে ফলেছে এই পেঁপে।

খরা-প্রতিরোধক উদ্ভিদ ঃ

পৃথিবীর এক এক অঞ্চলে আবহাওয়া এক এক রকমের। কোথাও গরম বেশি, আবার কোথাও বা ঠাণ্ডা বেশি। এই আবহাওয়াও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে গাছপালাও সেইরকম গড়ে উঠেছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গাছপালা নিয়ে গিয়ে শীতপ্রধান জায়গায় লাগালে যেমন সেই গাছপালা বাঁচতে পারে না, তেমনি আবার শীতপ্রধান অঞ্চলের গাছপালা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে লাগালে তাও বাঁচে না। এটা প্রকৃতির নিয়ম। সোভিয়েত ইউনিয়নের মাঙ্গিশ্লাক উপদ্বীপে বছরে তাপমাত্রা ওঠা-নামা করে ৭০ ডিগ্রি। তাই সেখানে সব ধরনের উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। সেখানে গরমের হাত থেকে মানুষজনকে বাঁচাবার উপযোগী এক ধরনের খরা-প্রতিরোধক উদ্ভিদ জন্মায়। প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা ঐ উপদ্বীপে অনেক রকমের গাছ লাগিয়ে দেখেছেন। কিন্তু কোনো গাছই বাঁচে না। একটি বিশেষ ধরনের লতানে গাছের পাতার খরা-প্রতিরোধক শক্তি আছে। ঐ উপদ্বীপের শোভচেংকো শহরের বাড়িগুলোতে জ্বলন্ত সূর্যের কিরণ থেকে বাঁচায় এই লতানে গাছগুলো। প্রচণ্ড খরার তাপ এই লতার পাতা শুষে নেয়। সত্যি, কী বিচিত্র উদ্ভিদ!

নতুন ফল পটামাটো ঃ

সংকর জাতের গরু, মিশ্র ধানের বীজ—এসবের কথা শুনে শুনে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। মিশ্র জাতের ফল গাছের কলম—যেমন আম, লেবু, এ ধরনের গাছের কলমের কথাও আমাদের অনেকের

জানা। কিন্তু আলু ও টমাটোর সংমিশ্রণে নতুন ধরনের ফল তৈরির কথা আমরা অনেকে এখনো শুনিনি। এই কৃষি বিপ্লবের যুগে কত কিছুই না সম্ভব হচ্ছে। সোভিয়েত কৃষি বিজ্ঞানীরা আলু ও টমাটোর সংমিশ্রণে একটা নতুন ধরনের উচ্চফলনশীল ফল ফলিয়েছেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে পটামাটো। আলু অর্থাৎ পটাটো আর টমাটোর কোষ নিয়ে এই সংকর গাছটি তৈরি করা হয়েছে। পটামাটো কীভাবে তৈরি হয় তা সোভিয়েত বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির ভাইস প্রেসিডেন্ট য়ূরি অভশিন্নিকভ স্লাইডের মাধ্যমে দেখিয়েছেন।

বিচিত্র গোলাপ গাছ :

গোলাপ ফুল আমাদের সকলের কাছেই খুব প্রিয়। পৃথিবীতে নানান জাতের গোলাপ ফুল আছে। রকমারি রং আর গন্ধের জন্য গোলাপ বিখ্যাত। এই গোলাপ গাছ সাধারণত খুব বেশি বড় হয় না। কিন্তু পৃথিবীতে এমন গোলাপ গাছের সন্ধান কি কেউ পেয়েছেন যা ৫ হাজার ৩শো ৮০ বর্গ ফুট জায়গা জুড়ে রয়েছে? এমন ব্যাপারটা আদৌ হয়তো কেউ চিন্তা করতে পারছেন না। হ্যাঁ, 'লেডি ব্যাঙ্ক' নামে একটা গোলাপ গাছ আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এরিজোনা প্রদেশের টম্বস্টোন নামক জায়গায়। বিরাট দৈত্যের মত এই গাছটা জন্মেছে একটা গোলাপ গাছেরই ডাল থেকে। ঐ ডালটা ১৮৮৪ সালে স্কটল্যাণ্ড থেকে আনা হয়েছিল সেখানে। 'লেডি ব্যাঙ্ক' নামের নিশ্চয়ই সার্থকতা আছে। বিচিত্র এই গোলাপ গাছটার গুঁড়ির পরিধি কত, হয়তো অনেকে কল্পনা করতে পারবেন না। এর গুঁড়ির পরিধি ২০ ইঞ্চি আর উচ্চতা ৯ ফুট। গাছটার শাখাপ্রশাখা চারিদিকে এমনভাবে বিস্তৃত যে এর ডালপালাকে ৬৮টা খুঁটির সাহায্যে মাচার মত করে রাখা হয়েছে। বলা যায় যে, সেটা একটা গোলাপের কুঞ্জবন। আর

এই গোলাপকুঞ্জের নিচে দশ-বিশজন নয়, একেবারে দেড়শো জন বসে চুটিয়ে গল্পগুজব করতে পারেন। সত্যি কী বিচিত্র গোলাপ গাছ।

বিশ্বের সর্বোচ্চ গাছ :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়ন, এই দুই বৃহৎ শক্তিধর দেশ একে অপরকে সমানে টেক্কা দিয়ে চলেছে নানা ক্ষেত্রে। একটা ব্যাপারে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে, শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নকেই বা বলি কেন, পৃথিবীর সব্বাইকে টেক্কা দিয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু গাছ সে দেশেই রয়েছে। সেখানকার ক্যালিফোর্নিয়াতে বেশ উঁচু উঁচু গাছ জন্মায়। এক একটা গাছ একশো মিটারেরও বেশি উঁচু হয়। এমন ধরনের উঁচু গাছ পৃথিবীর আর কোন দেশে সচরাচর দেখা যায় না। আপনারা অনেকে হয়তো জানতে চাইবেন, এটা কোন্ গাছ মশাই যে, এত উঁচু হয়! এই ধরনের উঁচু গাছের নাম সেখানে 'রেড উড ট্রি', বাংলা করলে দাঁড়ায় লাল কাঠের গাছ। আরো মজার ব্যাপার হল যে ক্যালিফোর্নিয়াতে এমন একটা ঐ লাল কাঠের গাছ আছে যেটা ১শো ১১ মিটার উঁচু। এমন উঁচু গাছ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। তাই এই গাছটা একটা বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী। এহেন একটা রেকর্ড করা গাছের নাম তো অবশ্যই দিতে হয়। সে দেশের লোক এর কী নামকরণ করবেন জানি না, তবে আমরা এর নাম দিতে পারি বিশ্ব সেরা লম্বু গাছ।

পশুপাখীর বিচিত্র জগৎ

হাতিদের স্কুল ঃ

আমাদের দেশে যেমন ফুটবল খেলোয়াড়দের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির চলে, তেমনি হাতিদের ফুটবল খেলা শেখাবার জন্য আছে স্কুল। ইন্দোনেশিয়ার জনবিরল জেলা ওয়েকাম্বাসে এই মজার স্কুলটা গড়ে উঠেছে। সেখানকার সব ছাত্র হচ্ছে হাতি। তাই বলে শিক্ষকরা কিন্তু হাতি নয়, মানুষ। সাধারণ ছাত্রছাত্রী হিসেবে ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুলে পড়াশুনোর একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। তেমনি ঐ স্কুলে হাতি-ছাত্রদের ফুটবল খেলা শেখানোরও নির্দিষ্ট সময় আছে। স্কুলের নিয়ম-শৃঙ্খলাও হাতিদের মেনে চলতে হয়। না মানলে শাস্তি বিধানেরও ব্যবস্থা আছে। সেখানে হাতিদের শেখানো হয় কেমন করে স্যালুট দিতে হবে, কংক্রিটের বেঞ্চের ওপর কেমন করে বসতে হবে—এমন নানারকমের আদব-কায়দা। তাছাড়া আছে কোন জিনিস মাটি থেকে কুড়োনো, কোন কিছু ধরে টানা ইত্যাদি। আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ট্রেনিং হল, কীভাবে ভাল ও পরিচ্ছন্ন ফুটবল খেলতে হয়। সাধারণ ফুটবল খেলায় বিধি ভঙ্গ করলে যেমন সংশ্লিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড়কে রেফারি সতর্ক করে দেন, তেমনি কোন হাতি যদি খেলা চলার সময় বলটাকে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে তবে তা 'হ্যাণ্ডবল' বলে গণ্য হবে। গোলরক্ষক হাতি শুঁড়ে করে বল আটকাতে পারবে। তবে হাতিদের এই খেলার বলটা হয় সাধারণ ফুটবলের চেয়ে চার গুণ বড়! ওয়েকাম্বাসের লামপুর-এর ঐ স্কুলের ছাত্ররা বেশির ভাগই আসে দক্ষিণ ও মধ্য সুমাত্রার-গ্রীষ্মপ্রধান গভীর জঙ্গল থেকে। স্কুলের ট্রেনিং মাত্র তিন মাসের। ভবিষ্যতে যদি দেখা যায় যে, বিশ্ব কাপ ফুটবলের আসরে

ইন্দোনেশিয়ার হাতিদের একাদশ খেলছে অন্য দেশের হাতিদের বিরুদ্ধে তবে অবাক হবার কিছু নেই। ততদিনে হয়তো অন্যান্য দেশও হাতিদের ট্রেনিং দিয়ে ফুটবল দল গড়ে তুলতে পারে। তবে মাথা গরম করে কোন সেণ্টার ফরোয়ার্ড হাতি যদি মানুষ রেফারিকে তাড়া করে তখন অবস্থাটা কিন্তু খুব ভাল দাঁড়াবে না।

হাতির অনাথ আশ্রম ঃ

বাবা-মা মরা ছেলেমেয়েদের অনাথ আশ্রমে রাখা হয়। দেশে বিদেশে এ ধরনের অনাথ আশ্রম অনেক গড়ে উঠেছে। মানুষের জন্য অনাথ আশ্রমের কথা জানা থাকলেও হাতিদের জন্য অনাথ আশ্রমের কথা অনেকেই জানেন না। কিন্তু এই ধরনের অনাথ আশ্রম আছে। যে সব বাচ্চা হাতির বাবা-মা কোন দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে বা যাদের বাবা-মা ফেলে রেখে চলে গেছে, বনের মধ্যে এসব বাচ্চা হাতির সন্ধান পেলেই বন থেকে এনে তাদের রাখা হয় অনাথ আশ্রমে। সেখানে এই অনাথ হাতিদের প্রতি বেশ ভালভাবেই যত্ন নেওয়া হয়। সেখানে প্রতিদিন তাদের ডাক্তারি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। খাওয়া-দাওয়ার প্রতিও যত্ন নেওয়া হয় সমানভাবে। প্রথম প্রথম বাচ্চা হাতিগুলোকে দুধ খাওয়ানো হয়। অনেক সময় আবার মানুষ শিশুর মত ফিডিং-বোতলের সাহায্যে তাদের দুধ পান করানো হয়। দেখতে খুব মজা লাগে। হাতির বাচ্চাগুলো সেখানে বেশ আরামেই থাকে। দিনকতক পরে ভুলে যায় তাদের আসল বাবা-মার কথা। এমনকি কোন হস্তিনীকে এনে সেখানে রাখা হয় বাচ্চা হাতিদের পালিতা-মা হিসাবে। আর সেই মাকেই তারা নিজের মা বলে মনে করে। এমন ধরনের অনাথ আশ্রম কোথায় আছে তা নিশ্চয়ই আপনাদের জানতে ইচ্ছা করছে? এই ধরনের একটা অনাথ আশ্রমের সন্ধান পাওয়া গেছে শ্রীলঙ্কার পিন্নাওয়ালাতে, হস্তী-শাবকদের জন্য এরকম

একটা অনাথ আশ্রম গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিল।

হাতির টাকা হজম ঃ

'পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়'—এরকম একটা প্রবাদ বহুদিন ধরে আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। ছাগলে নাকি কোন কিছু বাছবিচার না করে সবকিছুই খায়। কিন্তু তাই বলে কোন ছাগল এক গোটা টাকা বা এক বাক্স সিগারেট বেমালুম খেয়ে হজম করে ফেলেছে, এরকম ঘটনার কথা বোধ হয় শোনা যায়নি। কিন্তু একটা হাতির পক্ষে এটা সম্ভব। সম্প্রতি নেব্রাস্কার ইয়র্কে এ ধরনের একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। সেখানে 'বুচ' নামে ছ বছরের একটা হাতি তার মাহুতের ১ হাজার ডলার নোট ভর্তি একটা খাম বেমালুম খেয়ে হজম করে ফেলেছে। তার মাহুত মিকি বোহান্নন তিন সপ্তাহ ধরে অনেক কষ্ট করে ঐ অর্থ জমিয়েছিলেন তার পরিবারের বেড়াতে যাওয়া ও দুই ছেলেমেয়ের স্কুলের খরচ মেটানোর জন্য। গত ১৪ আগস্ট ইয়র্কের এক গ্রামীণ মেলায় কাজে ব্যস্ত থাকায় মিস্টার মিকি তার ঐ এক হাজার ডলার ভর্তি খামটা শার্টের পকেট থেকে বের করে বাইরে রেখেছিলেন। হাতিটা কিছুক্ষণ পরেই ডলার ভর্তি ঐ খামটা খেয়ে ফেললো। শুধু তাই নয়, সেখানে রাখা এক প্যাকেট সিগারেট আর লাইটারটাও বাদ গেল না। মাহুত এ দৃশ্য দেখে রীতিমত অবাক!

মাহুত বোহান্নন অবশ্য রেগে গিয়ে হাতিটাকে মারধোর করেননি। তিনি বলেছেন, বুচ টাকাটা হজম করে ফেললেও আমি তাকে মারধোর করতে চাই না। তবে বুচ বলতে গেলে আমার সর্বনাশ করলো। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, এর আগে তাঁর ঐ হাতিটা কয়েকটা কাপ ও ছোট বাক্স খেয়ে ফেলেছে। সত্যি, কী সর্বনাশা হাতি বলুন তো!

ট্রাফিক পুলিশ হাতি :

সাধারণত রাস্তার যানবাহন ও লোকের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে পুলিশ কনস্টেবল, একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু কেউ কি কোনদিন শুনেছে যে, এই ভিড় নিয়ন্ত্রণ করবে হাতি? তামিলনাড়ুর মাদুরাইতে জনবহুল সবজি বাজারে কনস্টেবলের মত দুটো বড় হাতি বেশ ভালভাবেই লরি, মোটর গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহন সামলাচ্ছে। ঐ জনাকীর্ণ বাজারের রাস্তায় যে সব যানবাহন জট পাকিয়ে যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করছে, হাতি দুটো শুঁড়ের সাহায্যে সেগুলোকে একদিকে সরিয়ে দেয়। রাস্তা পরিষ্কার রাখার কাজেও তারা রীতিমত সাহায্য করেছে। বাজারে এদিকে ওদিকে যেসব আবর্জনা জমে যায় তা তারা সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র ফেলে দেয়। কদিন ধরেই তারা একাজ করেছে। এর জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে পাচ্ছে প্রচুর খাদ্য এবং পয়সা। আসলে ঐ জায়গাটায় অনেক মন্দির আছে। মন্দির নগরীর বাসিন্দারা হাতি দুটোকে ভাবেন ভগবান গণেশের দূত। তাই তাঁরা হাতি দুটোকে পেট ভরে শাক সব্জি ও ফলমূল খেতে দেন। অনেক ভক্ত আবার পয়সাও দেন। পঁচিশ পয়সার মুদ্রাই তাদের বেশি পছন্দ। পাঁচ, দশ বা কুড়ি পয়সার মুদ্রা দিলে হাতি দুটো তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দৈনিক তাদের পঞ্চাশটা করে পঁচিশ পয়সার মুদ্রা সংগ্রহ হচ্ছে। এতেই তারা খুশি মনে পুলিশ কনস্টেবলের কাজ করে যাচ্ছে।

লটারির পুরস্কার হাতি :

পৃথিবীর সর্বত্র লটারি ও র‍্যাফেল খুব জনপ্রিয়। আর এসবের উদ্যোক্তারা নানা আকর্ষণীয় পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করে একে অপরকে টেক্কা দেবার চেষ্টা করেন। লটারির পুরস্কার হিসাবে নগদ টাকা, বাড়ি, গাড়ি, ফ্রিজ প্রভৃতি দেবার কথা শোনা

গেছে, কিন্তু লটারির পুরস্কার হিসাবে হাতি দেওয়া হচ্ছে একথা কেউ শুনেছেন কি ? ডুবাই-এ কেনিয়ান উৎসবে একটা র‍্যাফেলের দ্বিতীয় পুরস্কার হিসাবে একটা হাতি দেবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যিনি এই দ্বিতীয় পুরস্কার পাবেন তাকে এক বছরের জন্য হাতিটাকে পোষ্য হিসাবে রাখতে দেওয়া হবে। লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় হাতিটাকে একটা জায়গায় রেখে দেওয়া হবে। বাইরে একটা ফলকে পুরস্কার বিজয়ীর নাম খোদাই করে রাখা হবে। হাতিটার নাম 'এল্লা'।

শ্বেত হস্তী শাবক :

সোনার পাথর বাটি—কথাটা কেমন যেন বিসদৃশ, এটা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করবেন। হয়ত বলবেন, আরে মশাই, বাটিটা যদি সোনারই হবে তবে আবার পাথরের হবে কি করে ? হ্যাঁ, আপনাদের সঙ্গে আমিও এ ব্যাপারে একমত। আসলে এটা একটা কথার কথা। উজ্বল শ্যামবর্ণা মেয়েদের অনেক সময় ফর্সা টুকটুকে ছেলেমেয়ে হয়েছে এমন কথাও তো শোনা যায়। তবে কালো হাতির সাদা বাচ্চার কথা শুনলে আপনারা হয়ত অনেকেই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবেন ! ভাববেন একি আজব খবররে বাবা। এই আজব ঘটনা ঘটেছে ভিয়েৎনামের কেন্দ্রীয় প্লেটুর ডায়েরে প্রদেশে। যেখানে অতি সাধারণ একটা কালো হাতির পেট থেকে বেরিয়েছে সাদা ধবধবে একটা বাচ্চা। অবশ্য মানব শিশু নয়, হস্তী শাবক। এই হস্তীশাবকের মাকে এমাডে নামে এক কৃষক বন থেকে ধরে এনেছিলেন। হাতি পোষা তাঁর শখ। শুধু হাতি পোষা নয়, হাতিদের নানান আদব কায়দা শেখাতে তিনি রীতিমত ট্রেনিং দিয়ে থাকেন। ঐ কৃষক একসঙ্গে ষোলটা হাতিকে এখন ট্রেনিং দিয়ে বড় করে তুলছেন। শুধু এমাডে নয়, ঐ অঞ্চলের লোকেরা অনেকেই বনে গিয়ে বুনো হাতি ধরে এনে বাড়ীতে পোষ

মানান। কথায় বলে হাতির খোরাক। সুতরাং এই হাতি পোষার খরচ তাঁরা নিজেরাই বহন করেন। ঐ কৃষক তা হলে নিশ্চয়ই খুব অবস্থাপন্ন বলতে হবে। আর তাঁর পোষা হাতিগুলোর মধ্যে কালো রঙের হাতিটা জন্ম দিল অভিনব এই শ্বেত হস্তীর।

গরুর অভিযোগ :

থানায় মানুষ আসে অভিযোগ জানাতে। পশুপাখি থানায় এসে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে, এরকম ঘটনার কথা কেউ কোনোদিন শোনেননি। তামিলনাড়ুর থাঞ্জাভুর জেলার একটা পুলিশ ফাঁড়িতে ১৯৮৬ সালের আগস্ট মাসে এরকম এক বিচিত্র ঘটনা ঘটলো। এক অভিযোগকারী থানায় এলো পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে। শুনলে অবাক হতে হবে যে, এই অভিযোগকারী হল একটা গরু। তার গলায় একটা প্লাকার্ড ঝোলানো। তাতে লেখা—আমার মালিক মেরে আমার ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছে। এর বিচার চাই।'

অনেকে হয়ত জানতে চাইবেন—গরুটার অপরাধ কী? তার অপরাধ হল সে তার মালিকের এক প্রতিবেশীর বাগানে ঢুকে গাছপালা মুড়িয়ে খেয়ে ফেলেছে। ঐ প্রতিবেশী ভদ্রলোক মালিকের কাছে নালিশ জানালেন। আর তাতেই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে মালিক তাঁর গরুটাকে লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করলেন। সেই প্রহারের চোটে বেচারা গরুটার একটা পা গেল ভেঙে। ঐ ভাঙা পা নিয়ে গরুটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটছে। এমন সময় পাড়ার রসিক ভদ্রলোক ঐ প্রতিবাদের ভাষা লিখে গরুটার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। আর আশ্চর্য প্লাকার্ড গলায় নিয়ে গরুটা ঘুরতে লাগলো পাড়াময়। এটা দেখে তার মালিক নিজেই গরুটাকে নিয়ে থানায় গেলেন। হয়তো তিনি তাঁর প্রতিবেশীর বিরুদ্ধেই নালিশ জানাতেই

গিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশের লোকজন গরুটার গলার প্লাকার্ড দেখে রীতিমত হাসতে লাগলেন। বেচারা মালিকের মুখ দিয়ে তখন আর কোনো কথাই সরে না।

গরুর গা থেকে তাপ :

আমরা অনেকে বাড়ীতে গরু পুষি দুধ খাবার জন্য। আবার গরুর গোবর থেকে ঘুঁটে দিয়ে তা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বেশী গরু থাকলে অনেকে আবার গ্রামাঞ্চলে গরুর গোবরের সাহায্যে গোবর গ্যাস প্লাণ্ট স্থাপন করে থাকে। সেই গ্যাসে রান্না করা যায়, এমনকি ঘরে আলোও জ্বালানো যায়। এসব তো আমাদের অনেকের জানা কথা। কিন্তু শীতকালে ঘর গরম রাখার জন্য গরু পোষার কথা আমরা অনেকেই চিন্তা করিনি। গরুর গা থেকে নাকি উত্তাপ পাওয়া যায়। আর বাড়ীতে অন্ততঃ কুড়িটা গরু রাখলেই তাদের গায়ের তাপে একটা বড় ঘর গরম থাকবে। আধটন ওজনের একটা গরু সারা দিন রাত তার শরীর থেকে বারোশো ওয়াট তাপ ছড়াতে পারে। অবশ্য এটা একেবারে বাজে কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। আর গরুর সঙ্গে মানুষ একসঙ্গে থাকবে একথাও আমরা অনেকে চিন্তা করতে পারি না। তবে পশ্চিম জার্মানীর বৈদ্যুতিক শক্তি সংস্থার ইঞ্জিনিয়াররা গবেষণা করে এই তথ্য জানিয়েছেন, আর সে দেশের খামারগুলোতে গরুর গা থেকে এই উত্তাপ নেবার ব্যাপারটা রীতিমত সাফল্যলাভ করেছে। তাদের গবেষণা থেকে এটাও জানা গেছে যে, গোটা কুড়ি গরুর গা থেকে যে উত্তাপ পাওয়া যায় তাতে তিন হাজার তিনশো লিটারের মত জ্বালানীর সাশ্রয় করা সম্ভব।

শীতকালে ঘরে গরু রেখে গা গরম করবেন কিনা এখন ভেবে দেখুন।

মুরগীর গণ রোস্ট :

মুরগীর মাংস খেতে আমাদের প্রায় সকলেরই ভাল লাগে। বাজারে মুরগীর দরও কম নয়। কিন্তু এই মুরগীর সংখ্যা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয়ে গেলে কী করা হবে? নিশ্চয়ই এর উত্তর হবে—কেন, বিদেশে চালান করলেই তো সমস্যা মিটে যায়। মালয়েশিয়াতে কিন্তু এই মুরগী বিদেশে চালান যাচ্ছে না। সেখানে একশো দুশো নয়, একেবারে ৩০ লক্ষ মুরগীকে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য এই মুরগীর রোস্ট কারো খাবার জন্য নয়। নতুন ছোট মুরগীদের থাকার জায়গা করে দেবার জন্য এই ব্যবস্থা। বড় মুরগীগুলোকে মেরে কোথায় ফেলা হবে? তাছাড়া শুধু মেরে ফেললেই তো হবে না, তার থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে পরিবেশ দূষিত করতে পারে। সেইজন্য ঐ ৩০ লক্ষ মুরগীকে পুড়িয়ে মারার বিধান দেওয়া হয়েছে। আর পোলট্রি মালিকদের এই পরামর্শ দিয়েছেন সেখানকার মুরগী পালন বিভাগ ও ফেডারেশন অব লাইভস্টক ফার্মার্স সংস্থা। এদিকে ঐসব মুরগীকে পুড়িয়ে মারার বিধানে মালয়েশিয়ার বেশ কিছু লোক প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সে দেশে নিষ্ঠুরতা বিরোধী সমিতি এর প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। মালয়েশিয়া সরকারের পশুপালন বিভাগের হিসাব থেকে জানা গেছে যে, সেদেশে বছরে খাবার জন্য প্রায় ১২ কোটি মুরগীর প্রয়োজন। কিন্তু পোলট্রিতে মুরগীর, উৎপাদন হয়েছে ১৪ কোটির বেশি। তাই মুরগী নিয়ে সত্যিই সমস্যা দাঁড়িয়েছে। তাই এই ব্যাপক মুরগী হত্যার ব্যবস্থা। মুরগীকুল এর প্রতিবাদ জানাচ্ছে কিনা জানা নেই।

গোয়েন্দা শুয়োর :

কুকুরের ঘ্রাণশক্তি প্রবল। তাই ট্রেনিং দিয়ে কুকুরকে গোয়েন্দারা কাজে লাগান। পুলিশবাহিনীতে এই ধরনের কুকুর গন্ধ শুঁকে অপরাধী ধরতে সাহায্য করে—এ কথা আমরা অনেকেই জানি।

রক্ত বা অন্য কোন গন্ধ শুঁকে পুলিশ কুকুর অপরাধীর হদিশ করে বা জানিয়ে দিতে পারে কোন জায়গায় মাদ্রকদ্রব্য চোরাপথে চালান করা হচ্ছে। এই কাজে শুয়োরও যে দক্ষ হতে পারে—একথা আমরা কেউ কোনদিন শুনিনি। বিচিত্র এই পৃথিবীতে মাঝে মাঝে কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটে থাকে। পশ্চিম জার্মানিতে কুকুরের মত অদ্ভুত ঘ্রাণশক্তির অধিকারী একটা শুয়োরের সন্ধান পাওয়া গেছে। হিণ্ডেশিমের কাছে লুইস নামে এই শুয়োরটা তার ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে শুধু যে হেরোইন, মারিজুয়ানার বা অন্যান্য মাদকদ্রব্যের সন্ধান দিতে পারে তাই নয়, বিস্ফোরক পদার্থ কোথায় লুকনো আছে তার সন্ধানও দিতে পারে। পশ্চিম জার্মানির পুলিশ বাহিনীতে এই বিচিত্র ধরনের শুয়োরটা গোয়েন্দার কাজ করে গেছে তিন তিনটে বছর। আরো বহুদিন একে ঐ গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগান যেত। কিন্তু ঐ শুয়োরের ট্রেনার ইন্সপেক্টর ওয়ার্নার ফ্রাঙ্ক পুলিশ বাহিনী থেকে কিছুদিন আগে অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দা শুয়োরটাকে অবসর গ্রহণ করতে হয়েছে। কারণ ট্রেনার ছাড়া লুইসকে পরিচালনা করা শক্ত। নিয়ম অনুযায়ী অবসর গ্রহণের পর এই পুলিশ অফিসারকে আর কাজে বহাল রাখা যায় না। তাই লুইসেরও চাকরি গেছে। মাত্র তিন বছরের চাকরিতে লুইস অনেক গোপন জিনিসের সন্ধান দিয়েছে। লুইস এখন তাই তার মালিকের সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশে অবসরজীবন যাপন করছে। তার মালিক তিন বছর আগে তার সন্ধান পেয়ে নিজের কাছে এনে ট্রেনিং দিয়েছিলেন।

শুয়োরের সঙ্গে থেকে :

মানুষ যে পরিবেশে থাকে সেই পরিবেশের মত সে গড়ে ওঠে, এমন কথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয়। তাই মানুষের ওপর পরিবেশের বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার একটা প্রভাব নিশ্চয়ই আছে। কোনো

মানুষ জন্তু-জ্বানোয়ারের মত আচরণ করছে, একথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। নেকড়ে, পরিবারের মানুষ ভালুর কথা হয়তো আপনাদের অনেকের মনে আছে। উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরে শিশু অবস্থায় তাকে এক নেকড়ে বনের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। নেকড়ে পরিবারের সঙ্গে থেকে থেকে তার আচরণ হয়ে গিয়েছিল নেকড়ের মত। জ্যান্ত মুর্গি ধরে কাঁচা খেতেও তার বাধত না। একসময় বন থেকে উদ্ধার করে তাকে লোকালয়ে রাখা হল। কিন্তু সে বাঁচল না।

শুয়োরের সঙ্গে থেকে থেকে কোন মেয়ে শুয়োরের মত যদি আচরণ করে তবে তাকে কী বলবেন? হংকং থেকে এমনি একটা আশ্চর্যজনক খবর পাওয়া গেছে। সেখানে একটা শুয়োর খামারের মালিকের ১১ বছরের মেয়ের আচার আচরণ একেবারে শুয়োরের মত হয়ে গেছে। তার হাঁটা-চলা, খাওয়া-শোয়া সবই অবিকল শুয়োরের মত। আসলে তার বাবার খামারে শুয়োরের পালের সঙ্গে থেকে থেকে ছোটবেলা থেকেই সে তাদের অভ্যাস পেয়েছে। কিছুতেই সে অভ্যাস আর যায় না। মেয়ের এরকম অস্বাভাবিক আচরণে তার বাবাও রীতিমত চিন্তিত। সারাদিন শুয়োরের পাল চরিয়েই তার সময় কাটে। খবরটা পৌঁছল সে দেশের এক শিক্ষাসংস্থার কর্তৃপক্ষের কাছে। শুয়োরের খামার থেকে তাকে আনা হল ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। মানুষের মত স্বাভাবিক আচরণ করতে তাকে শেখানো হতে লাগল। নেকড়ে বালক ভালুর মত সে অসুস্থ হয়ে মারা গেল না। গত তিন বছরে মেয়েটা সত্যিই মানুষ হয়ে উঠেছে। অন্তত মানুষের মত আদব কায়দা শিখেছে।

বনমানুষের সহানুভুতি ঃ

আমরা বনমানুষের সম্পর্কে নানান ধরনের কথা বলে থাকি। অনেকে এদের অসভ্য হিংস্র বলে ভাবেন। কোন মানুষ অভদ্র আচরণ করলে, আমরা তাকে অনেক সময় বনমানুষের সঙ্গেও তুলনা

করি। কিন্তু এই বনমানুষের মধ্যেও যে প্রেম ভালবাসা ও সহানুভূতি থাকে একথা আমরা অনেকেই ভাবতে পারি না সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট হেলিয়ান চিড়িয়াখানা থেকে বনমানুষের সহানুভূতি ও সেবা পরায়ণতার চমৎকার খবর পাওয়া গেছে। পাঁচ বছরের ছেলে লেভান মেরিট চিড়িয়াখানায় বনমানুষ দেখতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে বনমানুষের আস্তানার মধ্যে পড়ে যায়। তার বাবা মা তো রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। চিড়িয়াখানার অনেক দর্শক চিৎকার আর চেঁচামেচি শুনে সেদিকে ছুটে এলেন।

এদিকে পাঁচ বছরের ঐ শিশুটিকে আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে বনমানুষগুলো ছুটে এল। বনমানুষদের সর্দার ইয়াম্বো লেভানের কাছে এসে ভাল করে তাকে দেখতে লাগল। অন্যসব বনমানুষকে সরিয়ে দিয়ে সর্দার এই মানব শিশুর গায়ে পিঠে হাত বোলাতে লাগল। সেই ঘেরা জায়গার বাইরে ততক্ষণে বহু লোক জড়ো হয়েছেন। সকলের চোখে মুখে উদ্বেগের ছাপ। ছেলেটার বাবা-মাও চোখে জল নিয়ে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। এদিকে লেভান বনমানুষের আস্তানায় পড়ে গিয়ে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তার একটা হাত ভেঙে গেছে। মাথায়ও চোট পেয়েছে। আর বনমানুষের সর্দার তার মাথায় ও গায়ে হাত বোলাচ্ছে। অন্য বনমানুষগুলোকে সে ধারে কাছে ঘেঁসতে দিচ্ছে না। কিছু পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সেই ছোট্ট ছেলেটি যখন এই দৃশ্য দেখল, তখন সে অবাক! বনমানুষ সম্পর্কে তার বিরূপ ধারণা গেল পাল্টে। এরই মধ্যে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ, দমকল বাহিনী ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দলের সাহায্যে ছেলেটিকে উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে এলে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

গনিতজ্ঞ কুকুর :

সার্কাসে কুকুরের অঙ্ক কষারও খেলা দেখে আমরা অনেকে আনন্দ পাই। ট্রেনিং পাওয়া কুকুরেরা অনেক আশ্চর্যজনক কাজ করে

অনেক সময় আমাদের তাক লাগিয়ে দেয়। শুধু ট্রেনিং পেয়ে নয়, পড়াবার সময় কোনো বাচ্চা ছেলের পাশে বসে থেকেও কুকুর সব লক্ষ্য করে অঙ্ক শিখে গেছে—এরকম ঘটনার কথাও জানা গেছে জার্মানি থেকে। সেখানকার ম্যানহেম নামে জায়গাতে এক ভদ্রমহিলা বাড়িতে তাঁর ছোট ছেলেটাকে রোজই অঙ্ক শেখান। ছোট্ট ছেলে। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ শেখাতে তাঁর মা মিসেস ফাও মোকেল রীতিমত হিমসিম খচ্ছেন। এক আর একে দুই, দুই আর একে তিন …এমনি করে তিনি অঙ্ক শেখান অন্যান্য পড়া শেষ করে। বাড়ির পোষা কুকুর 'রোলফ' তাদের পাশে বসে থেকে এসব লক্ষ্য করে। এমনি করে দিন যায়।

একদিন ঘটল অদ্ভুত কাণ্ড! ভদ্রমহিলা তাঁর ছোট ছেলেকে পড়াতে পড়াতে জিজ্ঞাসা করলেন, দুই আর দুই-এ কত? ছেলেটা চুপ করে বসে রইলো। কিছুক্ষণ পরে উত্তর দিল—তিন। ভুল হয়েছে বললে, উত্তর দিল—পাঁচ। কিছুতেই আর ঠিক বলতে পারে না। ভদ্রমহিলা তো রেগে অগ্নিশর্মা। এত শিখিয়েও শেষ পর্যন্ত কিনা এই সহজ অঙ্কটা বলতে পারছে না! ছেলেটার গালে সজোরে কষিয়ে দিলেন এক চড়। উত্তেজিত হয়ে পোষা কুকুর 'রোলফ' উঠে দাঁড়াল। কী যেন সে বলতে চায়।

মিসেস ফাও মোকেল কুকুরটার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—'রোলফ', তুমি বলতে পারবে দুই আর দুই-এ কত হয়? এবার আশ্চর্য হবার পালা। কুকুরটা তার সামনের দিকের ডান পায়ের থাবাটা দিয়ে মিসেস মোকেলের ডান হাতে চারবার আঘাত করল। আভাষে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল, দুই আর দুয়ে চার হয়। মিসেস মোকেল কিছুটা আশ্চর্য হয়ে আবার প্রশ্ন করলেন—বল তো 'রোলফ', চার আর চারে কত হয়? এবার কুকুরটা ঠিক ঐ ভাবেই সঠিক উত্তর দিল।

ভদ্রমহিলা দেখলেন কুকুরটার স্মরণশক্তি বেশ ভাল। তাকে

অঙ্ক শেখানোর জন্য তিনি উঠে পড়ে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত 'রোলফ' নানান ধরনের সরল অঙ্ক সমাধান করে দেবার বিস্ময়কর ক্ষমতা অর্জন করল! কুকুরটার বিস্ময়কর এই ক্ষমতার কথা অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাকে দেখতে মাঝে মাঝে ঐ ভদ্রমহিলার আত্মীয়-স্বজনের ভিড় জমতে শুরু করল। টেবিলে কটা ফল আছে, কটা নীল ফুল ফুলদানিতে আছে—এসব প্রশ্নের জবাব ইশারায় দিয়ে কুকুরটা রীতিমত সবাইকে অবাক করে দিতে পারে।

বাঘ-সিংহের মা কুকুর ঃ

ছোটবেলায় কোনো শিশুর মা মারা গেলে অন্য কোনো মহিলা তাকে প্রতিপালন করেন। সেই মহিলা হন তার পালিতা মা। শিশু বড় হয়ে তাঁকে মায়ের মতই ভক্তিশ্রদ্ধা করে। পশুদের মধ্যেও এমন ব্যাপার সচরাচর ঘটে থাকে। কিন্তু কোনো কুকুর, মায়ের মত আদর যত্নে বাঘ, সিংহ, হায়না, ওরাং-ওটাং এদের একসঙ্গে লালন-পালন করে বড় করে তুলেছে—এমন ঘটনার কথা শুনলে যে কেউ নিশ্চয় নড়ে চড়ে বসবেন।

ব্যাপারটা অবশ্যই মজার। সোভিয়েত ইউনিয়নের এরেভান চিড়িয়াখানায় এমন একটা কুকুর আছে, যে কিনা চিতাবাঘ, সিংহ, হায়না, ওরাং-ওটাং—এসব জন্তুদের ছোটবেলা থেকে ঐ চিড়িয়াখানায় লালন-পালন করে এসেছে। মা কুকুরের দুধ খেয়ে তারা বড় হয়েছে আর, ঐ পোষ্যপুত্রদের ওপর কুকুরটার অপত্য স্নেহ প্রবল। কুকুরটা রোজই দিনেরবেলা একবার চিতাবাঘের খাঁচায়, একবার সিংহের খাঁচায়, একবার ওরাং-ওটাং-এর খাঁচায় ঢুকে তাদের দেখে আসে। সকলে ভাল আছে দেখলে তাতেই তার স্বস্তি। তাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে সে একবার আদর করে আসে। আর আশ্চর্য, ঐসব হিংস্র জন্তু-জানোয়াররা কুকুরটাকে দেখে কখনো তার দিকে তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করেনি!

আত্মত্যাগী কুকুর :

উপকারী কুকুরের অনেক কাহিনীর কথা বিভিন্ন সময় শোনা যায়। নেপলসে একটা উপকারী কুকুর মনিবের মেয়ের জন্য আত্মত্যাগের বিচিত্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সেখানকার একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলছে সবকিছু। ভেতরে তিন বছরের একটা মেয়ে আটকে পড়েছে। আগুনে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত। হঠাৎ বাড়ির পোষা কুকুরটা সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ দিয়ে শিশুর পা ও জামা চেপে ধরে ফ্ল্যাটের বাইরে নিয়ে এল। জার্মান শেফার্ড জাতের ঐ কুকুরটা ভাবল হয়ত আর কেউ ঐ আগুনে ফ্ল্যাটের ভেতরে আটকে পড়েছে তাই আবার ছুটল তাদের উদ্ধারের জন্য। কিন্তু ঐ শিশুর ছ' বছরের দিদি আর বিধবা মা আগেই ফ্ল্যাটের বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। কুকুরটা তা টের পায়নি। আগুনে কুকুরটার দেহ ঝলসে গেল। দমকল বাহিনীর লোক আগুন নেভাতে এসে কুকুরটার মৃতদেহ উদ্ধার করলেন।

কুকুরের পেটে ঘড়ি :

একটা ছোট ঘড়িতে মাঝে মাঝে ঘন্টা বাজে। আর সেই ঘড়িটা যদি কেউ গিলে ফেলে তাহলে তার অবস্থাটা কি দাঁড়াবে তা অনেকেই কল্পনা করতে পারবেন না। অনেকে হয়ত বলবেন আরে মশাই, ঘড়ি আবার গিলে ফেলা যায় নাকি? কিন্তু কোন পাগলও তো একটা ছোট ঘড়ি গিলে ফেলতে পারে। তাহলে নিশ্চয়ই ঘড়িটা তার পেটের মধ্যে গিয়ে বাজবে, তাই না? আর অন্তত পেটে ব্যথা তো শুরু হবেই। কিন্তু ১৫ মাসের একটা কুকুরছানা হাজ একদিন ভুল করে হোক বা খেয়ালের বশেই হোক, তার প্রভুর ছোট্ট একটা বাজনা বাজানো ঘড়ি গিলে ফেলল। ঘড়িটার বৈশিষ্ট্য হল—প্রতি ১২ ঘন্টা অন্তর ঘড়িটায় টুংটাং শব্দ

করে বাজনা বাজে। আর কুকুরটার পেটে গিয়ে ঘড়িটায় একইভাবে বাজনা বাজতে লাগল। সকাল পৌনে সাতটায় একবার ঘণ্টা বাজে, আবার সন্ধ্যে পৌনে সাতটায় আর একবার। কুকুরটা ঐ বাজনা বাজার শব্দ হলেই ছটপট করে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। এইভাবে দু-তিনদিন কাটল। হাজের প্রভু হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে, ঘড়িটা টেবিল থেকে উধাও। খোঁজ খোঁজ, কিন্তু কিছুতেই তার সন্ধান মিলল না। শেষে তিনি একদিন সন্ধ্যায় শুনতে পেলেন, কুকুরটার পেটের মধ্য থেকে ঘড়িটার চাপা শব্দ আসছে। কিন্তু পরদিন আর তা শুনতে পেলেন না। তাঁর সন্দেহ হল। ডাকলেন এক পশু চিকিৎসককে। কুকুরের পেটে এক্সরে করে দেখা গেল ঘড়িটা রয়েছে। অস্ত্রোপচার করা হল। দেখা গেল পাকস্থলীর জারক রসে ঘড়িটা আপনা থেকে ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছে। তাছাড়া ঘড়িটা এমন জায়গায় আটকে আছে যে, সেটাকে টেনে বের করা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পাঁরে। তাই ডাক্তার ঘড়িটা হাজের পেট থেকে বের না করে তার কাটা জায়গাটা সেলাই করে দিলেন। হাজের প্রভু তো রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন —ডাক্তারবাবু যে করেই হক হাজকে বাঁচান। ডাক্তার তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, ভয় নেই, ঘড়িটা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষয়ে ক্ষয়ে পেট থেকে বেরিয়ে আসবে।

কুকুরের বাঘ শিকার :

মহারাষ্ট্রের এক উপজাতি কৃষক ও তার কুকুরটি অবিশ্বাস্য এক সাহসিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। একটি বাঘের সঙ্গে ১৫ মিনিট ধরে লড়াই করে তারা বাঘটিকে মেরে ফেলেছে। ঘটনাটি ঘটে ভাঘাপুর গ্রামে। হঠাৎ বাঘ দেখে কুকুরটি চিৎকার শুরু করলে বাঘটি তার দিকে তেড়ে যায়। তখন তার প্রভু টুকারাম যাদব একটি লাঠি হাতে ছুটে আসে। বাঘটি কুকুরটিকে ছেড়ে তার

প্রভুর ওপর লাফিয়ে পড়ে। কুকুরটি তখন বাঘের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাকে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করে দেয় এবং একসময় সে বাঘের টুঁটি কামড়ে ধরে। এইভাবে বাঘ বাবাজী টুকারাম ও তার কুকুরের হাতে মারা পড়ে। দুজনেই অবশ্য বাঘের হাতে সাংঘাতিক-রকম জখম হয়।

বাঘ নিয়ে নাটক :

বনের চিতা বাঘ যদি শহরে এসে কোনো শিল্প কারখানার মধ্যে আশ্রয় নেয় তবে অবস্থাটা যে খুব গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে একথা বলাই বাহুল্য। দিল্লীর ওয়াজিরপুরে এরকমের এক চিতা বাঘকে নিয়ে নাটক রীতিমত জমে উঠলো। সেখানকার একটা শিল্প কারখানার এসি প্ল্যান্টে এক চিতা বাঘ ঢুকে পড়লো। বন থেকে বেরিয়ে পথ হারিয়ে রাজকুমার চিতা বাঘ হয়ত ঢুকে পড়েছিল লোকালয়ে ঐ কারখানায়। ফলে কারখানার কাজ বন্ধ। বাইরে হুলস্থূল কাণ্ড। ঐ জায়গাটা থেকে কাছাকাছি বনের দূরত্ব বেশ কয়েক মাইল। গুরগাঁও ছাড়িয়ে হরিয়ানা সীমান্তের সোহনা বনাঞ্চলে চিতা বাঘ থাকে। সেখান থেকে হঠাৎ এই চিতা কী করে যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঐ ঘরে ঢুকে পড়লো, তা সত্যিই ভাববার বিষয়। মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে বাঘ বাবাজীর সেখানে পৌঁছতে কোনো অসুবিধা হয়নি। অবশ্য চিতা বাঘটা মরণ ফাঁদেই ঢুকে পড়েছিল। কেন না এই নাটকের শেষ পর্যন্ত অবসান ঘটেছে তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। বাঘ ধরার জন্য ঘুমপাড়ানি গুলি ছোঁড়া হল। প্রয়োগ করা হল কাঁদানে গ্যাস। রক্তাক্ত দেহে বাঘ লুটিয়ে পড়লো মৃত্যুর কোলে। মৃত্যু বরণ করলো সেই বনের রাজকুমার। শেষ হল বাঘ নাটকের এক করুণ অধ্যায়।

বৃষ্টির জন্য গাধার বিয়ে :

বৃষ্টির দেবতা বরুণকে সন্তুষ্ট করার জন্য অনেকে অনেক কিছু করে থাকেন। সকলেই প্রার্থনা জানান বৃষ্টির জন্য। আর এই

বৃষ্টি অসহ্য গরমের হাত থেকে মানুষকে যেমন স্বস্তি দেয়, তেমনি কৃষি কাজেরও সহায়ক। তাই যুগে যুগে নানান জায়গায় নানান ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কোন এক জায়গায় বৃষ্টির দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে গ্রামবাসীরা একটা পুরুষ ও একটা স্ত্রী ব্যাঙকে ধরে বিয়ে দিয়েছেস, একথাও শোনা গেছে। তামিলনাড়ুর সালেম জেলার নানাঞ্চল গ্রামের মানুষরা বৃষ্টির জন্য বরুণ দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন। এতকাল ধরে তাঁরা এ জন্য মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিতেন। কিন্তু এখন হয়তো ঐ পূজোতে বরুণ দেবতা সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। তাই গ্রামবাসীরা নতুন পন্থা অবলম্বন করলেন। তাঁরা একটা পুরুষ আর স্ত্রী গাধা জোগাড় করলেন। গ্রামের মাঝখানে প্রকাশ্যে গাধাদুটোকে দাঁড় করিয়ে তাদের বিয়ে দিলেন। আর বিয়েটা কিন্তু যেমন তেমন ভাবে দেওয়া হয়নি। একেবারে হিন্দু মতে বিয়ে দিয়েছেন। স্থানীয় এক পুরোহিত শাস্ত্রমতে মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে এই বিবাহকার্য সম্পন্ন করেছেন। আর গাধা দুটোর বিয়ের আসরে কয়েকশো মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য তাঁরা তাই বলে বরযাত্রী বা কনে যাত্রী নন। তবুও সকলে বিয়ের আসরে হাজির হয়ে গাধা দম্পতিকে আশীর্বাদ করেছেন। মালা বদলও করিয়ে দিয়েছেন পুরোহিত ভদ্রলোক একেবারে নিজের হাতে। কনে সম্প্রদানের জন্য অবশ্য গাধানীর বাবা উপস্থিত ছিল না।

বাঁদরামো ঃ

কানপুরের অশোকনগর এলাকায় একটা বাঁদরের বাঁদরামোর দরুন স্থানীয় লোকেরা রীতিমত শঙ্কিত হয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে শুরু করেছিলেন। দশ বছর ধরে বাঁদরটা ঐ অঞ্চলে বেশ ভালভাবেই গাছে গাছে বা বাড়ির ছাদে ছাদে ঘুরে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ তার কী যে হল, যে যাকে পায় তাকে কামড়ে দেয়।

১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে এই খ্যাপা বাঁদরটাকে নিয়ে সত্যিই সমস্যা দেখা দিল। বাঁদরটা প্রায় ৩০০ লোককে কামড়ে দিয়েছে। গুরুতর আহত ২০০ জনকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। বাঁদরটার অত্যাচারে আতঙ্কগ্রস্ত লোকজনদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে দেখে স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন বাঁদরটাকে মেরে ফেলতে হবে। নিয়োগ করা হল একজন পেশাদার শিকারী। শিকারীর বন্দুকের গুলিতে বাঁদরটার আয়ু শেষ হল। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। এর জন্য শিকারীটি পেল ৭০০ টাকার মত পারিশ্রমিক।

বাঁদরের লিফট দখল :

বার্লিনের চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়ে আসা একদল বাঁদর বিমানবন্দরের ব্যস্ততম কয়েকটা লিফটে চড়ে বসলো। শুধু লিফটে চড়ে বসা নয়, লিফটের বোতাম টিপে তারা একবার ওপরে ওঠে, আর একবার নিচে নামে। এমনিভাবে চলল বাঁদরগুলোর বাঁদরামির খেলা। মজা লুটতে লাগল তারা। সত্যি কী মজা, কী মজা। বিমানবন্দরের যাত্রীরা আটকে পড়লেন। কেউ ওপরে উঠতে পারছেন না। বা কেউ নিচে নামতে পারছেন না। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। কী করা যায়? শেষ পর্যন্ত একটা উপায় ঠিক হল। বাইরে থেকে লিফটের যাত্রীদের টেনে বের করা যাচ্ছে না। তাই বন্দুকে ঘুমপাড়ানো গুলি ভরে গুলি করা হল লিফটের ভেতর হৈ হুল্লোড়কারী বাঁদরগুলোকে লক্ষ্য করে। লক্ষ্য অব্যর্থ। এতেই কাজ হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঁদরগুলো, অচৈতন্য হয়ে পড়ল। তাদের কবল থেকে উদ্ধার করা হল লিফটগুলো। বাঁদরদের বের করে আবার স্বাভাবিকভাব সচল করা হল লিফটগুলোকে। সবারই মুখে হাসি ফুটল।

বাঁদরের প্রভুভক্তি :

বাঁদরের বাঁদরামীর কথাও যেমন শোনা যায় আবার বাঁদরের প্রভূভক্তির নিদর্শনও পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রের হুবলীতে সেদিন এমনি এক প্রভূভক্ত বাঁদর তার প্রভূকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

সেই বাঁদরওয়ালা নাচ দেখাবার বাঁদরটাকে নিয়ে পথে ঘুরে ঘুরে নাচ দেখাচ্ছিল আর পয়সা রোজকার করছিল। দুপুরবেলা ক্লান্ত হয়ে সেই বাঁদরওয়ালা একটা মাঠে গাছের সঙ্গে বাঁদরটাকে বেঁধে রেখে শীতের রোদে পিঠ রেখে ঘুমিয়ে পড়লো। হঠাৎ কোথা থেকে সেখানে গিয়ে হাজির হল একটা গোখরো সাপ। বাঁদরটা তাই দেখে শুরু করল লম্ফ ঝম্প। কিন্তু তার প্রভূর আর ঘুম ভাঙে না। ততক্ষনে সেই বিষধর গোখরো সাপটা বাঁদরওয়ালার মাথার ওপর ফনা তুলে দাঁড়িয়েছে। বাঁদরটা প্রাণপণ চেষ্টা করে বাঁধন ফেললো খুলে। তারপর নিমেষে ঝাপিয়ে পড়লো সাপটার ওপর। কিছুক্ষণ ধরে চললো সাপে বাঁদরে লড়াই। ততক্ষণে সেই বাঁদরওয়ালার ঘুম ভেঙে গেছে। সে দেখলো সেই অবাক কাণ্ড। শেষ পর্য্যন্ত সাপটা মারা পড়ল। বাঁচলো সেই বাঁদরের প্রভুর প্রাণ। ক্লান্ত বাঁদরটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলো বাঁদরওয়ালা। ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসের গোড়ায় এই ঘটনাটার খবর পাওয়া গেছে।

চোরাকারবারী বাঁদর :

সুকুমার রায়ের লেখা সৎ পাত্র ছড়ায় তৈরী ছেলে গঙ্গারামের কথা অনেকেরই মনে আছে—গঙ্গারাম তো তৈরী ছেলে জাল করে নোট গেছেন জেলে। কিন্তু এখন ঐ মানুষ গঙ্গারামের মত এমন এক তৈরী বাঁদরের সন্ধান মিলেছে, যে মাদক দ্রব্যের চোরা কারবার করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলে গেছে।

পাকিস্তানের বালুচিস্থানে এক বাঁদর ধরা পড়েছে মাদক দ্রব্য এমনকি ড্রাগ পাচারের সময়। নাম অবশ্য গঙ্গারাম নয়, নাম বিজো। বিজো তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে নিয়মিত খরিদ্দারদের কাছে ড্রাগ পৌঁছে দিত। তার বিনিময়ে খরিদ্দারদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তুলে দিত তার মালিক মহম্মদ নঈম খানের হাতে। খান সাহেবই ঐ বাঁদরটাকে তালিম দিয়ে ঐ চোরাকারবারে দক্ষ করে তুলেছিল। পুলিশের পক্ষে ঐ বাঁদরটাকে কোনো রকমে ধরা সম্ভব হচ্ছিলো না। মালিকের নির্দ্দেশমত সে নির্দ্দিষ্ট স্থানে মাদক দ্রব্য পৌঁছে দিতে গিয়ে দৈবাৎ যদি পুলিশের দেখা পেতো বা কোনো বিপদের ঝুঁকি দেখতো তবে সোজা লাফ দিয়ে উঠে যেতো কাছাকাছি কোনো গাছে। এইভাবে সেই তৈরী বাঁদরটা আত্মরক্ষার সহজ পথ বেছে নিয়েছিল। কিন্তু সেদিন একটু অসর্তক ছিল। তাই পুলিশের খপ্পরে পড়ে গেল। এখন বেচারী বিজো শ্রীঘরে। তার দুই সাকরেদ বাঁদরও ধরা পড়েছে। আইন আছে মানুষ চোরা কারবারীর সম্পর্কে। কিন্তু বাঁদরের শাস্তি দেওয়া হবে কোন আইনে? আর বিপদের সংকেত পেয়ে ঐ বাঁদরের মালিক অনেক আগে থেকেই গা ঢাকা দিয়েছে। এখন এই নায়কের সন্ধান চলছে। বাঁদরের বাঁদরামীর অনেক নমুনার কথা আমরা শুনে থাকি। পূজো দিতে যাওয়া নরনারীর কাছ থেকে ফলমূল কেড়ে খাওয়ার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথাও জানা গেছে। বলা বাহুল্য এই ঘটনার নায়ক একদল বাঁদর সিমলার কাছে ঝাকু হনুমান মন্দিরের পাহাড়ী পথের দুধারে এক শ্রেণীর বাঁদরের উপদ্রব ইদানীং খুব বেড়েছে। শতাধিক বাঁদরের এক একটা দল পাহাড়ী পথের পাশে ঝোপের ধারে বসে থাকে। ভক্তরা ঐ মন্দিরে পূজো দিয়ে ফিরে আসতেই বাঁদরের দল তাকে ছেঁকে ধরে। প্রসাদী থালায় বা ঝুড়িতে যা কিছু ফলমূল থাকে তা দাবী করে। কোনো ভক্ত যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বাঁদরদের কিছু ফলমূল দিয়ে দেয় তো

ভাল। তা না হলে বাঁদরের দল তা কেড়ে নেয়। কেউ বাধা দিলে আর রক্ষে নেই। বাঁদর কুলের হাত থেকে তার পৈতৃক প্রাণ নিয়ে ফিরে আসাটা রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

বিরল জাতের বাঁদর :

বাঁদরের কথাতেই যখন এলাম তখন এক ধরনের বিচিত্র বাঁদরের খবর দিই। বাদুড়ের মত দেখতে ও বাদুড়ের মত নিশাচর এবং স্তন্যপায়ী এক ধরনের উড়ন্ত বাঁদর আছে আমাদের এই পৃথিবীতে। উড়ন্ত বাঁদর বললেও এরা কিন্তু বাদুড়ের মত উড়তে পারে না। তবে এক লাফে এক গাছ থেকে ৬০ মিটার দূরে অন্য গাছে এরা লাফিয়ে চলে যেতে পারে। সমস্ত দেহটা এদের একটা চামড়ায় ঢাকা, এমনকি লেজ পর্য্যন্ত। আর এরই সাহায্যে ওপর থেকে নিচে এরা শূন্যে ভাসতে ভাসতে নামতে পারে। ইংরাজীতে এই জাতের বাঁদরের নাম কবেগো। তবে এই জাতের বাঁদরের দৃষ্টিশক্তি মোটেই ভাল নয়। এরা ঘ্রানশক্তির সাহায্যে বুঝতে পারে সামনে কি আছে।

এদের খাদ্য সাধারণত পোকা মাকড়। এই ধরনের স্ত্রী বাঁদরের এক কালে একটা বাচ্চা হয়। এই বাচ্চা যতদিন না বড় হয়, স্বাবলম্বী হয়, ততদিন সে মায়ের বুক জড়িয়ে থাকে সব সময়। মা তার সন্তানকে নিয়েই লাফ দেয় এক গাছ থেকে অন্য গাছে।

মাত্র একটা বেড়াল ছানার জন্য :

টেলিভিশানের আবিষ্কর্তা জন বেয়ার্ডের কথা আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু জানা নেই তাঁর আশ্চর্য এক খেয়ালের কথা। যে বিজ্ঞানী মানুষকে আধুনিক জীবনের এই সুন্দর উপহারটি দিয়েছেন তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে তিনি যে কতবড় দয়ালু ছিলেন, তাঁর মনটা যে কত কোমল ছিল একটা ছোট

ঘটনার মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত হয়। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। চারিদিকে বোমা পড়ছে। যুদ্ধের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। বিজ্ঞানী বেয়ার্ড তখন থাকতেন সিডেনহেমে তাঁর নিজের বাড়িতে। বাড়ি ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। অথচ সেখানে থাকাটা মোটেই নিরাপদ নয়। শেষে তাঁর বন্ধু বান্ধবরা তাঁকে অনেক বোঝালেন। তাড়াতাড়ি গাড়ি করে নিয়ে গেলেন সোজা লণ্ডনের একটা বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে এলো গবেষণাগারের অনেক দামী জিনিসপত্র। বিজ্ঞানী লণ্ডনের বাড়িতে পৌঁছেই সব দেখেশুনে নিলেন। কিন্তু একী! তাঁর একটা মূল্যবান জিনিস যে সেখান থেকে আনা হয়নি। জিনিসটা কী? বন্ধু-বান্ধবরা প্রশ্ন করলেন। বিজ্ঞানী জবাব দিলেন না। অস্থির হয়ে উঠলেন সিডেনহেমের বাড়িতে যাবার জন্য। যে করেই হোক ঐ জিনিসটা তাঁর আনা চাই। বন্ধুরা ভাবলেন এটা তাঁর নেহাৎই একটা খামখেয়ালীপনা। যাই হোক নাছোড়বান্দা বিজ্ঞানীর কথামত তাঁরা আবার গাড়ি নিয়ে ছুটলেন সেই পুরনো বাড়ির দিকে। অনেকে ভাবলেন গবেষণাগারের কোনো যন্ত্রপাতি বা অন্য কোন মূল্যবান জিনিস হয়ত তিনি ভুল করে ফেলে এসেছেন। বিজ্ঞানী বেয়ার্ডও গাড়িতে চললেন তাঁদের সঙ্গে। বাড়িতে পৌঁছেই তিনি ঘর থেকে সযত্নে তুলে নিলেন তাঁর আদরের পোষা বেড়াল ছানাটাকে। সকলেই অবাক। বিজ্ঞানী ততক্ষণে তাঁর পোষা বেড়াল ছানাটাকে বুকে চেপে ধরে আদর করছেন। আর তাঁর দুচোখে ঝরছে অশ্রু। সে এক করুণ দৃশ্য। এরই জন্য শত শত মাইল ছুটে আসা। হ্যাঁ, সেই বেড়াল ছানাটাকে নিয়েই বিজ্ঞানী বেয়ার্ড ফিরে এলেন তাঁর লণ্ডনের নতুন বাড়িতে।

দেড় কোটি ইঁদুর নিহত :

চীন দেশে জনসংখ্যাও যেমন বেশি, তেমনি ইঁদুরের সংখ্যাও খুব বেশি। সেদেশে ইঁদুর নিয়ে দারুণ সমস্যা দেখা দিয়েছে।

ইঁদুরে সেখানে বছরে দেড় কোটি টন খাদ্যশস্য খেয়ে নষ্ট করে বলে এক হিসাব থেকে জানা গেছে। এছাড়া ইঁদুরগুলো অন্যান্য সমস্যারও সৃষ্টি করে থাকে। বেজিং শহর থেকে এখবর পাওয়া গেছে। এই ইঁদুর সমস্যার মোকাবিলা করার কাজে তাই চীন সরকার নেমে পড়েছেন। চীনের রাজধানী বেজিং-এ এবছর প্রায় দেড় কোটি ইঁদুর এখনও পর্যন্ত মেরে ফেলা হয়েছে। শুধু ইঁদুর ধরা আর মারা—এ ব্যাপার নয়। আর ইঁদুর ধরা কলেও এত ইঁদুর নিশ্চয়ই ধরা যায় না। তাই প্রয়োগ করা হয়েছে ইঁদুর মারার ওষুধ, খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'মজাদার' খাবার খেয়ে ইঁদুরগুলোর প্রাণান্ত হয়েছে। তোফা ভোজের পর মর্মান্তিক মৃত্যু! সেখানে এই ইঁদুর নিধন যজ্ঞে কর্তৃপক্ষকে ১ হাজার ১শো ৫০ টন ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়েছে। তবেই মারা পড়েছে ঐ দেড় কোটি ইঁদুর।

ইঁদুরের আক্রমণে শিশু :

একদিকে চীনে ইঁদুরের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় যেমন সেখানে কর্তৃপক্ষ পয়সা খরচ করে বিষ প্রয়োগ করে ইঁদুর মারছেন, তখন লেবাননের রাজধানী বেইরুটের শহরতলিতে ইঁদুর নিয়ে নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেখানে প্যালেষ্টিনীয় উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে বড় বড় সব ইঁদুর রীতিমত আতঙ্ক! সেখানকার শিশুরা তো এখন ইঁদুর দেখলেই ভয়ে চিৎকার করে উঠছে। রাতের অন্ধকারে ইঁদুরগুলো শিবিরের তাঁবুতে ঢুকে অনেক শিশুকে কামড়েছে। আর আশ্চর্যের ব্যাপার বয়স্ক কোন লোকের ধারে কাছে ইঁদুরগুলো ভিড়ছে না। তারা অন্ধকারে তাঁবুতে ঢুকে বেছে বেছে শিশুদেরই আক্রমণ করছে। তাঁবুতে আলো থাকলে ইঁদুরের দল ঢুকতে সাহস পায় না। ফলে শরণার্থীদের যেসব মোমবাতি দেওয়া হয়েছিল তা সব খরচ হয়ে গেছে। তাই তাঁবুর মধ্যে আলো

জ্বালাবার উপায় নেই। আর এরই সুযোগ গ্রহণ করছে ওই ধেড়ে ইঁদুরগুলো। কী দারুণ ব্যাপার একবার ভেবে দেখলে গা শিউরে ওঠে!

সাপের ছলনা :

প্রকৃতিতে কত আশ্চর্যজনক ঘটনাই না ঘটে থাকে। গাছপালা, মানুষ, পশুপাখি—সবাই আত্মরক্ষার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে থাকে। কেউ কেউ আবার ছলনার আশ্রয় নিয়ে থাকে। অনেক পশুপাখি আবার শিকার ধরার জন্য অভিনয় করে থাকে। কথায় বলে দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। উত্তর আমেরিকার বুলস্নেক নামে সাপেরা অবশ্য তাই বলে দুরাত্মা, একথা বলছি না। তবে এই সাপেরা সত্যিই ছলনার আশ্রয় নেয় শিকার ধরার জন্য। এদের দেখতে ছোটখাটো ময়াল সাপের মত হলেও এরা ফণা তুলে ছোবল মারতে পারে। রাস্তার পাশে হঠাৎ দেখা গেল যে, একটা বুলস্নেক পেটের দিকটা ওপরে তুলে চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে। কোন পথচারী অথবা গরু, মোষ তাকে দেখে ভাববে, সাপটা মরে পড়ে আছে। নির্ভয়ে যেই সাপটার কাছে যাওয়া, অমনি সে তড়াক করে লাফিয়ে ফণা তুলে হিস হিস শব্দ করবে। এইসব বড় বড় প্রাণীদের দেখলে এরা রীতিমত ক্ষেপে যায়। ছোবল মারতেও চেষ্টা করে। তবে কোন মানুষের হাতে লাঠিসোটা থাকলে সেই সাপ যখন বোঝে তার সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না, তখনই কিন্তু তারা আর লম্ফ-ঝম্প করে না। মড়ার মত পড়ে থেকে ছলনা করতে থাকে। শ্বাস প্রশ্বাসও নেয় খুব ধীরে। এমনকি লাঠি দিয়ে উল্টে দিলেও মড়ার মত পড়ে থাকে। মানুষ চলে গেলে সুযোগ বুঝে ঐ সাপেরা সরে পড়ে। ইঁদুর এদের প্রিয় খাদ্য। তিরিশটারও বেশি বড় ইঁদুর তারা একসঙ্গে খেতে পারে। একটা বুলস্নেকের পেট থেকে একবার ৩৫টা বড় ইঁদুর পাওয়া গিয়েছিল বলে জানা যায়।

সাপের ভয়েঃ

ভারতে গ্রামাঞ্চলে প্রতিবছর বর্ষার সময় সাপের কামড়ে বহুলোক প্রাণ হারান। অবশ্য বিজ্ঞানীরা বলছেন, এর মধ্যে বিষধর সাপের কামড়ে মারা যান খুব অল্প লোক। বেশির ভাগই মারা যান নাকি আতঙ্কে। মাঝে মাঝে শহরাঞ্চলে সাপের উপদ্রব যে ঘটে না, তা নয়। সাপের ভয়ে কোন শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা হোস্টেল ছেড়ে পালিয়ে গেছেন—এরকম ঘটনা সত্যিই অভিনব। আর এই অভিনব ঘটনা ঘটেছিল বাংলাদেশের খোদ ঢাকার জাহাঙ্গির নগর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। সেখানে ১৯৮৭ সালের মার্চের শুরুতে গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাপেরা আশেপাশের ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকে পড়ে। ছাত্ররা তিনটে বিষধর সাপকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। কিন্তু হলে কী হবে, সাপের উপদ্রব ক্রমে বেড়েই চলে। ফলে হোস্টেল ছেড়ে ছাত্রছাত্রী ভয়ে পালিয়ে যায়, এক সপ্তাহে সেখান থেকে পালিয়ে যায় প্রায় একশো ছাত্রছাত্রী। অবশ্য ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের ভাগই বেশি। 'বাংলাদেশ টাইমস'-এর সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা এ খবরটা জানিয়েছিল!

প্যাকেটের খাবারে সাপ:

কলের জলের মধ্যে সাপের অস্তিত্বের ব্যাপারে আমাদের কলকাতাতে আগে অনেক হৈ-চৈ হয়েছে। কলের মুখ থেকে সাপ পড়ার ঘটনাটা আশ্চর্যের হলেও হতে পারে। কিন্তু প্যাকেটের খাবারের মধ্যে সাপের অস্তিত্ব মানুষকে সত্যিই ঘাবড়ে দিতে পারে। এমনিভাবে বৃটেনের এক গৃহিণী সত্যি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। সেখানকার দোকান থেকে তিনি কড়াইশুঁটির একটা প্যাকেট কিনে আনলেন। সত্যি লোভনীয় চেহারা কড়াই শুঁটিগুলোর। প্যাকেটটা তিনি খুললেন রান্না করবেন বলে।

কিন্তু কী আশ্চর্য ! প্যাকেটের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো সাপের একটা ছোট্ট মাথা। প্যাকেটের ভেতরে রয়েছে কিছু নোংরা কড়াইশুটি। ভয় পেয়ে ভদ্রমহিলা রীতিমত চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলেন। আশেপাশের লোকজন ছুটে এল। সবাই অবাক ! শেষ পর্যন্ত তিনি নালিশ ঠুকলেন ঐ প্যাকেটের সামগ্রীর প্রস্তুতকারকদের বিরুদ্ধে।

সর্পহীন দেশে আগন্তুক সাপ ঃ

কেউ হঠাৎ সাপ দেখলে নিশ্চয়ই আঁৎকে উঠবে। সর্পভীতি আমাদের সকলেরই আছে। ভারতে গ্রামাঞ্চলে প্রতিবছরই সাপের কামড়ে বহু লোক মারা যায়, বলা বাহুল্য এইসব সাপ খুবই বিষধর। আফ্রিকার জঙ্গলেও অনেক বিষধর সাপ আছে। কিন্তু পৃথিবীর এমন দেশও আছে যেখানে সাপের দেখা মেলে না। সেখানকার লোক যদি হঠাৎ কোন সাপ দেখে, তবে অবস্থাটা কীরকম দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়।

মালদ্বীপের মালেতে এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল। জাহাজে করে ঐ দ্বীপে কাঠের পেটিতে কিছু পণ্য এল। শুল্ক বিভাগের অফিসাররা তার মুখ খুলে দেখতে গেলেন ওতে কিছু চোরাচালান সামগ্রী আছে কিনা। সেই সময় হঠাৎ তিনফুট লম্বা একটা বিষধর সাপ তার মধ্য থেকে ফণা তুলল। শুল্ক বিভাগের অফিসাররা হকচকিয়ে গেলেন। ১৯৮৬ সালের ১৭ ডিসেম্বরের এই ঘটনা ঐ বন্দর শহরে রীতিমত সোরগোল তুলেছিল। কেননা ভারত মহাসাগরের ঐ দ্বীপটিতে সাপ বলে কোন প্রাণী নেই। সিঙ্গাপুর থেকে আসা লোহা-লক্কড় ভর্তি ঐ পেটির মধ্যে এই মারাত্মক আগন্তুকটিকে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই মেরে ফেলা হয়েছিল।

সেখানকার বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্রের একজন প্রবীণ কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে ঐ আগন্তুক যদি পালিয়েও যেত, তবে সেটা বেশিক্ষণ

বেঁচে থাকতে পারত না। কেননা সেদেশের পরিবেশে সাপ বেঁচে থাকতে পারে না। ঐ বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্রের গবেষণাগারে এখন মরা সাপটাকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ব্যাঙেদের ভাষা ঃ

কুনো ব্যাঙ ও কোলা ব্যাঙেরা নাকি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে থাকে। মানুষের মত ব্যাঙেদেরও নাকি ভাষার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ আছে। এক এক শ্রেণীর ব্যাঙ এক এক ভাষায় কথা বলে। প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্যাঙেদের এই ভাষা কী করে বোঝা যাবে? না, না, এটা আমার কথা নয়, মাদুরাই-এ কামরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ জে বি আব্রাহাম ব্যাঙদের ওপর পাঁচ বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে এই তথ্য প্রকাশ করেছেন। ব্যাঙেদের নিয়ে তাই বলে মোটেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছি না!

বিচিত্র মাকড়সা ঃ

মাকড়সা আমরা সকলেই দেখেছি। কিন্তু পৃথিবীতে কত বিচিত্র ধরণের মাকড়সা আছে তার খবর আমরা অনেকেই রাখি না। বাড়ীতে একটা বড় মাকড়সাকে দেওয়ালে বসে থাকতে দেখলে আমরা অনেকে রীতিমত ভয় পেয়ে যাই। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আকারের মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায় দক্ষিণ আমেরিকা ও ব্রাজিলে। আটটা পা ছড়িয়ে দিলে এই জাতীয় মাকড়সার মাপ দাঁড়ায় দশ ইঞ্চিরও বেশী। মোটা ও ভারী মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায় পেরুতে। সেখানে এই ধরণের একটা মাকড়সার ওজন ছিল ৭৮৪ গ্রাম। এই রেকর্ডটা বেশ যত্ন করে লিখে রাখা হয়েছে। তবে প্রায় আটশো গ্রাম ওজনের এই মাকড়সাকে দেখলে শুধু ছোটরা কেন অনেক বড় বড় লোকেরাও রীতিমত ভয় পেয়ে যাবেন। ব্রাজিলের পি, ফারা জাতীয় মাকড়সারা যেমন বড় তেমন

হিংস্র। সবচেয়ে বড় মাকড়সার কথা যেমন বললাম, তেমনি সবচেয়ে ছোট মাকড়সাও আছে পশ্চিম সামোয়াতে। এদের দৈর্ঘ্য কত জানেন? মাত্র ০.৪৩ মিলিমিটার অর্থাৎ একেবারেই ছোট।

লাফাতে পারে এমন ধরণের মাকড়সা আছে বৃটেনে। আদিম প্রজাতির এক ধরনের মাকড়সা আছে যারা মাকড়সাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশীদিন বেঁচে থাকে। টারানটুলা নামে এই প্রজাতির মাকড়সার ২৮ বছর আয়ুর রেকর্ড আছে।

কালো মাকড়সারা দেখতে ছোট হলেও কিন্তু বিষাক্ত। এদের বিষ থেকে তৈরী হয় দামী ওষুধ! আর এই ওষুধের জন্য ঐ সব মাকড়সার বিষ রীতিমত চড়া দামে বিক্রী হয়। এইসব মাকড়সার এক গ্রাম বিষের দাম ৩ হাজার ডলারেরও বেশী। কাজাখাস্তানের একটা চিড়িয়াখানায় ছশো কালো মাকড়সা আছে। এদের বিষও খুব মূল্যবান। বিচিত্র ধরণের এইসব মাকড়সার কথা শুনে আপনারা অনেকেই হয়ত বিস্মিত হচ্ছেন! বিস্মিত হবারই কথা। তবে আপনারা যাঁরা বাড়ীতে আরশোলা আর মাকড়সা নিধনের কাজে ব্যস্ত তাঁদের কাজে কিন্তু মোটেই বাধা দিচ্ছি না।

ডলফিনের বন্ধুত্ব ঃ

সমুদ্রে তিমি প্রজাতির একটি প্রাণীর নাম ডলফিন। এদের দাঁত আছে। সাধারণত এরা ৬ ফুট থেকে ৮ ফুটের মত লম্বা হয়ে থাকে। এদের পেটের রঙ সাদা। আর পিঠের দিকে রঙ কালো বা ঘন বাদামী। ডলফিনের পাখায় কাঁটা থাকে। এর সাহায্যে এরা আত্মরক্ষা করে। এরা দাঁড়ের মত পাখনা নেড়ে জলের ঢেউ-এর অনুকূলে সাঁতরে চলে। ঠোঁট এবং পিঠের দিককার পাখনা বলতে গেলে তিমিরই মতন। এদের বৈজ্ঞানিক নাম গুডোনটোমেটি। সমুদ্রে কোন জাহাজ ভেসে চললে তার পেছনে পেছনে ডলফিনের দল নানান কেরামতি দেখিয়ে চলে, এমন ঘটনার

কথা প্রায়ই শোনা যায়। এরা মুখ দিয়ে এমন শব্দ করে যা শুনলে মনে হয় কোন মানুষ ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। ডলফিনরা বাজনা শুনতে খুব ভালবাসে। জলতরঙ্গ বাজলে এরা তন্ময় হয়ে তা শোনে। গ্রীক নাবিকেরা সমুদ্রে ডলফিন দেখতে পেলে তাকে মঙ্গলসূচক বলে মনে করতেন।

ডলফিনেরা মানুষ পছন্দ করে। মানুষের সঙ্গে ডলফিনের বন্ধুত্বের অনেক কাহিনীও প্রকৃতি বিজ্ঞানে লেখা আছে।

একবার এক সংকীর্ণ উপসাগরে নাকি একটা ডলফিন গিয়ে হাজির হয়েছিল। সেই উপসাগরের পাড় দিয়ে এক দরিদ্র ছাত্র রোজ যাতায়াতের পথে সেই ডলফিনটাকে দেখতে পেত। ছেলেটা সেই ডলফিনের নাম রেখেছিল 'সিমো'। প্রতিদিন স্কুলে যাতায়াতের পথে ঐ উপসাগরের পাড় থেকে সে ডলফিনটাকে নাম ধরে ডাকত। আর 'সিমো' ডাক শুনলেই ডলফিনটা সোজা পাড়ের কাছে এসে হাজির হত। ছেলেটা কয়েক টুকরো রুটি ছুঁড়ে দিত জলে। আর ডলফিনটা তা খেয়ে চলে যেত। এইভাবে ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যে এমনই বন্ধুত্ব গড়ে উঠল যে ছেলেটাও ডলফিনের কাছে গিয়ে হাজির হত। আর ডলফিনটাও তার হাতের স্পর্শে সুখ অনুভব করত। তারপর একদিন দেখা গেল ঐ ছেলেটি ডলফিনের পিঠে চেপে স্কুলে যাচ্ছে। শুধু যাওয়া নয়, যাতায়াত দুইই চলত ঐ বন্ধু ডলফিনের পিঠে চেপে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল যে, ডলফিনটা তার পিঠের কাঁটাগুলো গুটিয়ে এমনভাবে রেখে দিত যাতে ছেলেটা কাঁটার আঘাত না পায়। বেশ কয়েকবছর এইভাবে চলল। তারপর ছেলেটা হঠাৎ কঠিন রোগে মারা গেল। ডলফিনটা জানতে পারল না। ডলফিনটা রোজই সেই নির্দিষ্ট জায়গায় এসে ছেলেটার জন্য অপেক্ষা করত। কিন্তু দেখা না পেয়ে ভারাক্রান্ত মন দিয়ে ফিরে যেত। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল ডলফিনটা ঐ উপসাগরের পাড়ে মরে পড়ে আছে। অনেকের অনুমান বন্ধুর

শোকেই 'সিমো' মারা গেছে। ন্যাচারাল হিস্ট্রি বইতে এই কাহিনীটা লেখা আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই বইটা লিখেছেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক প্লিনি। ঘটনাটা ঘটেছে অগাস্টাস সিজারের রাজত্ব কালে।

নৃত্য শিল্পী মৌমাছি :

নাচিয়া নাচিয়া এসো নন্দদুলাল। না নন্দদুলাল নয়, মৌমাছিদের নাচের খবর জানাচ্ছি। মৌমাছিদের নাচের দৃশ্য হয়ত অনেকে দেখেননি। অথচ মৌমাছিরা নাচে। খাবার জিনিসের সন্ধান পেলে তারা বিচিত্র ধরণের নাচের মাধ্যমে অন্য মৌমাছিদের জানিয়ে দেয়। তারা যখন একনাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে নাচে, তখন বুঝতে হবে সেখানে প্রচুর খাবার আছে। তাদের নাচের বিভিন্ন ধরণও আছে। পেছন দিকটা তুলে যখন তারা আস্তে আস্তে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে, তখন বুঝতে হবে যে জায়গায় তারা খাবারের সন্ধান পেয়েছে সেই জায়গাটা নাচের জায়গা থেকে ২০ গজের মধ্যে। উত্তর বা দক্ষিণের কোনো দিকে খাবারের সন্ধান পেলে মৌমাছিরা পেছন দিকটা তুলে নাচতে থাকে। মৌমাছিরা যদি ৫০ বার একই দিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে তবে বুঝতে হবে, যে জায়গায় খাবার আছে, সেটা ৫০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত। সত্যি কি বিচিত্র ব্যাপার! পশ্চিম দিকে খাবার থাকলে মৌমাছিরা সোজাসুজি উড়ে থাকে। খাবারের জায়গাটা যদি পূর্ব দিকে অবস্থিত হয়, তবে মৌমাছিরা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে উড়ে থাকে। মৌচাক তৈরী করার উপযুক্ত স্থান বেছে পেলে শ্রমিক মৌমাছিরা ছন্দ তুলে নাচতে থাকে। এই নাচ দেখে অন্যান্য মৌমাছিরা সহজেই বুঝতে পারে নাচের প্রকৃত অর্থ কি। এরপর তারা সবাই মিলে ঐ উপযুক্ত জায়গাটাতে মৌচাক তৈরী করার কাজে এগিয়ে যায়। মৌমাছিরা সর্বদাই মৌচাকের কোণাকুণি জায়গায় অবস্থান করে।

সেই জায়গা থেকে কোণাকুণি কিছুটা গেলেই পাওয়া যায় মৌচাকের সন্ধান। বিশেষজ্ঞরা অনেক গবেষণা করে সম্প্রতি এই বিচিত্র তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

কাঁকড়াবিছের চাষ :

কাঁকড়াবিছের কামড় যারা খেয়েছেন তাঁরাই জানেন তার বিষের কী জ্বালা। বিষাক্ত কাঁকড়াবিছের কামড়ে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে। এই বিষাক্ত কাঁকড়াবিছে বাড়িতে পোষার কথা আপনারা কেউ কি কোনদিন ভাবতে পারেন? না, কাঁকড়া-বিছে পোষা নয় কাঁকড়াবিছের চাষ করার এই বিচিত্র ঘটনার কথা জানা গেছে চীন থেকে। আর বিষাক্ত কাঁকড়াবিছের চাষ করে চীনের এক যুবক রীতিমত ধনী হয়ে উঠেছেন। তাঁর এখন মূলধন দাঁড়িয়েছে এক দু হাজার ডলার নয়, পুরো ২৭ হাজার ডলার। তিনি বিষাক্ত কাঁকড়াবিছে চাষের এক খামার গড়ে তুলেছেন। তাতে রয়েছে হাজার হাজার কাঁকড়াবিছে। স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ওই চীনা যুবক। চীন সরকারও তাঁকে এই কাজে সাহায্য করেছেন। এই কাঁকড়াবিছের খামার গড়ে তুলতে তাকে সরকার ৪ লক্ষ ৫ হাজার ডলার সাহায্য দিয়েছেন।

এখন আপনারা অনেকে হয়ত প্রশ্ন তুলবেন, কাঁকড়াবিছে চাষ করে লাভটা কি? হ্যাঁ, এই কাঁকড়াবিছের বিষ থেকে সে দেশে তৈরি হয়ে থাকে মাথাধরা, হাঁপানী অন্যান্য ধরনের অসুখবিসুখের ওষুধ। দেশীয় পদ্ধতিতে তা তৈরি হয়। সুতরাং এর জন্য চাষ চলছে বিষাক্ত কাঁকড়াবিছের। যুবকটির এই দুঃসাহসিক কাজ সত্যি প্রশংসা করার মত। হয়ত এইজন্য কাঁকড়াবিছের কামড়ও তাকে খেতে হয়েছে।

বিচিত্র পাখি :

মানুষের যেমন বিভিন্ন ধরনের বাড়ি আছে, তেমনি পাখিদেরও বিভিন্ন ধরনের বাসা আছে। পাখিদের জগতে আমরা দেখতে পাই কোন পাখি গাছের কোটরে বাস করে, কোন পাখি আবার মানুষের পাকা ঘরের ফোকরে বাসা বাঁধে। খড়কুটো নিয়ে গাছের ডালেও নীড় তৈরি করে অনেক পাখি। শুধু মাটি দিয়ে পাখির নীড় তৈরির ঘটনার কথা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। মুখ আর পায়ে করে এঁটেল মাটি এনে গাছের ডালে নীড় তৈরি করে এক ধরনের পাখি। গাছের ডালের ওপরে ও নিচে সুন্দর করে মাটি লেপে লেপে এরা গোলাকৃতি নীড় বানায়। মাঝখানে থাকে পথ। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় এই ধরনের পাখি দেখতে পাওয়া যায়। এদের নাম ওভেন বার্ড।

আশ্চর্য ধরনের দামী মাছ :

যতই দিন যাচ্ছে পৃথিবীতে অনেক বিরল জাতের পশুপাখী বিলুপ্ত হচ্ছে। এই সব পশুপাখীর বংশ যাতে বিলুপ্ত না হয়, তার জন্য নানান ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। যাদুঘরে আমরা অনেক বিরল জাতের লুপ্ত প্রাণীর সন্ধান পাই। এমনি এক বিরল জাতের মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে পূর্ব আফ্রিকার মানাগামী দ্বীপের কাছে সমুদ্রে। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে এই ধরনের মাছ মাত্র ৮টা পাওয়া গেছে। অনেক খোঁজ খবর করেও আর একটা মাছও পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে রীতিমত গবেষণা করে অবাক হয়ে গেছেন। দশ লক্ষ বছরেরও আগে পৃথিবীতে এই ধরনের মাছ ছিল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বর্তমান শতাব্দীতে কি করে এই ধরনের মাছের সন্ধান মিললো। ১৯৩৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর আফ্রিকার সমুদ্র উপকূলে এই মাছ পাওয়া

গেল। জেলেদের জালে মাছ ধরার সময় ধরা পড়লো বিরাট আকৃতির ঐ মাছটা। নীলাভ রঙের ঐ মাছটার ওজন ছিল প্রায় দেড়শো পাউণ্ড। মাছটা লম্বায় ৫ ফুটের মত। মাছটার দেহে পুরু আঁশ। খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। দক্ষিণ আফ্রিকার ইষ্ট লন্ডন যাদুঘরে পাঠানো হল মাছটার পরিচয় জানার জন্য। যাদু-ঘরের কর্ত্রী মিসেস ফ্যাটিমার এর আগে অনেক মাছ নিয়ে গবেষণা করেছেন। কিন্তু তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না মাছটা কোন জাতের মাছ। সহকর্মীদের ডেকে পাঠালেন। কিন্তু না কেউই সঠিক কিছু বলতে পারলেন না। তিনি মাছটার ছবি এঁকে তা পাঠালেন রোডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য গবেষক মিঃ স্মিথের কাছে। মিঃ স্মিথ মাছটার ছবি দেখে রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেলেন! আরে এ যে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাছ। এখন এটা পাওয়া গেল কি করে! তিনি মাছটার নাম দিলেন ল্যাটিমেরিয়া। বলা বাহুল্য নামটা একটা ল্যাতিন নাম। অবশ্য এই মাছের চলতি নাম আছে। নামটা হল সিলাকান্থ। ১৯৭৪ সালে শেষ বারের মত সিলাকান্থ মাছ পাওয়া গিয়েছিল। এখনো এ নিয়ে অনুসন্ধান ওগবেষণা চলেছে। এখনো পর্যন্ত পৃথিবীতে এইটাই সবচেয়ে দামী মাছ।

বিস্ময়কর আবিস্কার

হাঁটার আগে সাঁতার শেখা ঃ

সাঁতার শেখে না কেউ না খেয়ে জল, হাঁটিতে শেখে না কেউ না খেয়ে আছার। হাঁটতে শেখার আগে কোন শিশু সাঁতার শিখে ফেলেছে, ব্যাপারটা সত্যিই অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। বাস্তবে কিন্তু তাই ঘটছে। অবশ্য আমাদের দেশে নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নে। সে দেশের তাজাকিস্তানের কুরগান তিউবে শিশু পলিক্লিনিকে শিশু-দের হাঁটতে শেখার আগে শেখানো হচ্ছে সাঁতার। এর জন্য তৈরী হয়েছে ছুটি সুইমিং পুল। একটি একেবারে শিশুদের জন্য, আর একটি একটু বড় শিশুদের জন্য। এই সাঁতার শেখানোর মাধ্যমে শিশুদের শরীরটাকে শক্ত করে তোলা হয়। সাঁতারের মাধ্যমে চিকিৎসারও ব্যবস্থা আছে। হাত-পা কীভাবে নাড়তে হয়, সে ব্যবস্থা ছাড়াও জিমন্যাষ্টিক্সের নানারকম কসরতও শিশুদের শিখিয়ে তাদের চৌখস করে তোলা হয়। এরপর শিশুদের হাঁটতে শেখানোটা খুব সহজ হয় এবং তারা তাড়াতাড়ি হাঁটতে শেখে। শিশু পলিক্লিনিকে শিশুদের ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থাও আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এসব ব্যবস্থার লাভটা কী? লাভ নিশ্চয়ই আছে। চিকিৎসকদের মতে এই ব্যবস্থার ফলে শিশুরা শক্ত-সমর্থ হয়ে বেড়ে উঠতে পারে। তাদের রোগ-প্রতিরোগ শক্তি গড়ে ওঠে। শিশু বয়স থেকেই ছেলেমেয়েদের এভাবে গড়ে তোলা, বিশেষ করে সাঁতার শেখাবার এই অভিনব ব্যবস্থা আমাদের অনেকের কাছেই রীতিমত শিক্ষণীয় বিষয়। অবশ্য এই সাঁতার শিখতে গিয়ে শিশুরা নিশ্চয় জলে হাবু-ডুবু খেয়ে কিছুটা জল খেয়ে নেয়। আর তার বিরুদ্ধে প্রশিক্ষকরা অবশ্যই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।

দাঁত থেকে অপরাধী গ্রেপ্তার :

এক পাটি দাঁত থেকেই এক অপরাধী ধরা পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা শহরে এক বৃদ্ধা মহিলার বাড়িতে এক ডাকাত ডাকাতি করতে গেল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তার ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হল। ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে গিয়ে ঘটনাটা জানালেন, ঘটনাস্থলের কাছ থেকে পুলিশ এক সেট বাঁধানো দাঁত কুড়িয়ে পেল। আর তা থেকেই ডাকাতকে চিহ্নিত করা সম্ভব হল। এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা বাদে একটা পানশালায় খোঁজ পাওয়া গেল এক দাগী আসামী ৬২ বছর বয়স্ক জোশেফ বেনেটকে। পুলিশ লক্ষ্য করল যে, জোশেফের মুখে একপাটি দাঁত নেই। সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে সে এতই বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল যে, ঐ ঘটনার কথা সে আদৌ মনে করতে পারল না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কুড়িয়ে পাওয়া এক পাটি দাঁত আর জোশেফকে নিয়ে পুলিশ গিয়ে হাজির হল এক দন্ত চিকিৎসকের কাছে। জোশেফের মুখে দাঁত লাগিয়ে দেখা গেল, ঐ একপাটি দাঁত বেশ ভালভাবেই তার মুখে বসে গেল। জোশেফ এখন শ্রীঘরে।

ক্যাসেট-চিঠি :

আমরা দূর দেশে আত্মীয়-স্বজনকে চিঠি লিখে নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা জানাই। আর দেশের অন্যত্র দূর জায়গাতেও আত্মীয়-স্বজন থাকলে তাঁকে চিঠি লিখে জানাই মনের কথা। খাম-পোস্টকার্ডে চিঠি লিখেই কোনো সুখ-সংবাদ বা দুঃসংবাদ জানানোর রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু এখন যুগের অগ্রগতি ঘটেছে। টেলি-ফোনে আমরা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এমনকি বিদেশে আপনজনকে নিজেদের খবরা-খবর জানাই। কিন্তু অতি সম্প্রতি এর জন্য আর একটা মাধ্যম চালু হয়েছে। সেটা হল টেপ রেকর্ডারের

ক্যাসেট। হ্যাঁ আমরা যে ক্যাসেট টেপ রেকর্ডারে ভরে প্রিয় সঙ্গীত শিল্পীদের গান শুনে আনন্দ পাই, ঠিক সেইরকম ক্যাসেট। অবশ্য এতে গান-বাজনা থাকবে না, থাকবে আমাদের সুখ-দুঃখের কথা। খাম-পোস্টকার্ড নয়, এখন যিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কাছে নিজের সুখ-দুঃখের খবর জানাতে চান, তিনি নিজের টেপ রেকর্ডারে তা রেকর্ড করে ঐ ক্যাসেট পাঠিয়ে দেবেন নির্দিষ্ট প্রাপকের কাছে। ক্যাসেটের ওপরের মোড়কে অবশ্য প্রাপকের নাম-ঠিকানা লিখতে হবে। আর সঙ্গে অবশ্য প্রয়োজমীয় ডাকটিকিট লাগাতে হবে। সব জায়গাতেই এই ব্যবস্থাটা চালু করা যেতে পারে। কিন্তু আপাতত বাংলাদেশে খামের চিঠির বদলে এই ক্যাসেট-চিঠি ব্যবহার করা হচ্ছে। ডাকে ক্যাসেট-চিঠি পেয়ে প্রাপক ঘরে বসেই টেপ রেকর্ডারে সেই ক্যাসেট চালিয়ে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকা প্রিয়জনের কথা শুনতে পারছেন। ব্যবস্থাটা সত্যিই অভিনব বলতে হরে।

ঘড়ি চালাতে আলু ঃ

যদি বলা যায় ঘড়ি চলে আলুর সাহায্যে, তবে নিশ্চয়ই আপনারা অবাক হবেন। কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই সত্যি। একটা ভারতীয় আর একটা হল্যাণ্ডের আলু একটা ইলেকট্রনিক্স ঘড়ির সঙ্গে সংযুক্ত করতেই ঘড়িটা টক টক করে চলতে শুরু করল। এই ধরনের একটা মজার ঘড়ি সম্প্রতি ভারতের কৃষিমন্ত্রী জি. এস. ধিলোঁকে উপহার দিয়েছেন নেদারল্যাণ্ডসের আলু উপদেষ্টা কমিটির অধিকর্তা ডঃ ভ্যান আর্কেল। তিনি জানিয়েছেন যে, এই ঘড়িটার সাহায্যে আলুর ফলন কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে তা জানা যাবে। সম্প্রতি নতূন দিল্লিতে ভারত ও হল্যাণ্ড আয়োজিত আলু সম্পর্কিত এক আলোচনা চক্রে হল্যাণ্ডের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। আলু ঘড়ির ব্যাটারির কাজ করে,-এ এক উপভোগ্য সংবাদই বটে।

মাত্র দু ঘণ্টায় :

আগামী দু হাজার সালের মধ্যে পৃথিবীতে এমন একটা বিমান তৈরী হবে যা দু ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যেতে পারবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা বিমান কোম্পানির এক-মুখপাত্র মিসৌরির সেণ্ট লুইতে জানিয়েছেন যে, ট্রান্স অ্যাটমোস-ফেয়ারিক ভেহিকিলস নামে এই বিমান দু ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় উড়ে যেতে পারবে। বেশ কয়েক মাস ধরে ঐ কোম্পানি এই বিমান তৈরির কাজে ব্যস্ত রয়েছে। বায়ু-মণ্ডলে যে কোন স্তরে এই বিমান চলবে।

অনুবাদক টেলিফোন :

টেলিফোনে কেউ কথা বলতে চাইলে অন্যলোক অর্থাৎ যার সঙ্গে তিনি কথা বলবেন তাকে অবশ্যই তার ভাষা বুঝতে হবে। নইলে তো টেলিফোনে কথা বলা অর্থহীন। কিন্তু আপনি যদি এমন একজনকে টেলিফোন করতে চান, যিনি আপনার ভাষা বোঝেন না। তাতে অবশ্য অসুবিধা নেই। এখন এমন টেলিফোন বেরিয়েছে যা আপনার কথা যার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছেন তার ভাষায় অনুবাদ করে দেবে। ব্যাপারটা নিশ্চয় খুব আশ্চর্যজনক বলে মনে হচ্ছে, তাই না? না টেলিফোনে কথা বলার ব্যাপারে ভাষা এখন আর কোনো সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না। অনায়াসে যে কোনো ভাষাভাষী লোকের সঙ্গে কথা বলা যাবে। আপনি যে ভাষাতেই কথা বলুন না কেন অন্য প্রান্তে যিনি টেলিফোন ধরে আছেন তিনি নিজের ভাষাতেই তা শুনতে পাবেন। ঠিক উল্টো-ভাবে আবার অপরপ্রান্তে যিনি কথা শুনে উত্তর দেবেন আপনি তা নিজের ভাষাতেই শুনতে পাবেন। অনুবাদকের কাজটা টেলিফোন নিজেই করে দেবে। সবই হবে কম্পিউটর ব্যবস্থার মাধ্যমে। ব্যাপারটা অনেকেই হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবেন না।

এটা আশ্চর্যজনক ঘটনা হলেও বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এধরনের অনুবাদক টেলিফোন উদ্ভাবন করেছেন। হংকং-এ এখন এই বিচিত্র ধরণের টেলিফোন চালু হয়েছে। আপাততঃ এই টেলিফোন সাতটা ভাষার অনুবাদ করতে পারছে। তবে এটাই কিন্তু শেষ কথা নয়। বিজ্ঞানীরা বেশ জোর দিয়েই বলেছেন যে, ভবিষ্যতে এ জাতীয় টেলিফোনে পৃথিবীর সব ভাষাতেই অনুবাদ সম্ভব হবে। যাদের বাড়ীতে টেলিফোন আছে বা ভবিষ্যতে যাঁরা টেলিফোন নেবেন তাঁরা এখন থেকেই তৈরী থাকুন বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে অন্যদেশে বা দেশের মধ্যে অন্যরাজ্যের বন্ধু থাকলে তাদের সঙ্গে বেশ খোলামেলা আলাপ করতে পারবেন।

কারো সঙ্গে দেখা হলে বা টেলিফোনে কথা বলার সময় 'হ্যালো' না বলে বলুন 'আইয়ুবোয়ান'। এতে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য তুলে ধরা হবে। শ্রীলংকার সংস্কৃতি মন্ত্রী জনগণের কাছে এ আহ্বান জানিয়েছেন।

সিংহলী আইয়ুবোয়ান শব্দের অর্থ 'দীর্ঘজীবী হও'। হ্যালো না বলে দেশীয় শব্দ ব্যবহার করে সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করার জন্য মন্ত্রী অনুরোধ জানান।

পিসার স্তম্ভ ঝুঁকে পড়েছে :

গত এক বছরে পিসার সেই বিখ্যাত স্তম্ভটি আরো কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন একশ বছরের মধ্যেই স্তম্ভটি মাটিতে পড়ে যাবে।

পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেরো গেড়ি সম্প্রতি বলেছেন, ১৯৮৭ সালের জুন মাস থেকে পিসার স্তম্ভটি ·০৫ ইঞ্চি ঝুঁকে পড়েছে। যে মাপ নেওয়া হয়েছিল তাতে তা ধরা পড়ে।

স্তম্ভটিকে প্রতি ছ'মাস অন্তর অন্তর পরীক্ষা করা হয়। যে সদস্য দল এটি পরীক্ষা করেন গেড়ি তার মধ্যে একজন। গত ডিসেম্বর

মাসে ওই গবেষক দল পিসাকে পরীক্ষা করে আশার কথা শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন, পিসার ঝুঁকে পড়ার গতি কমে আসছে, কিন্তু পরীক্ষার পর গেড়ি বলেছেন, পিসার গড়পড়তা ঝুঁকে পড়ার গতি এখন প্রায় এক ইঞ্চি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫৫ মিটার উচ্চ স্তম্ভটি তৈরি হয়েছিল ১৩৬০ থেকে '৭০ সালের মধ্যে। এখন এটি লম্বভূমি থেকে ৪.৪২ মিটার ঝুঁকে রয়েছে।

অভিনব ভি. ডি. ও ওয়াকম্যান :

এখন পৃথিবীর সব দেশেই লোকে ছোটখাটো ছিমছাম জিনিষ বেশী পছন্দ করছে। ছোট ক্যামেরা, ছোট টেপরেকর্ডার থেকে শুরু করে ছোট টেলিভিশন, ভি. ডি. ও প্রভৃতি মানুষের বেশী পছন্দ। ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর ক্ষেত্রে জাপান বলতে গেলে অনেকটা এগিয়ে গেছে। কাগজের মলাট দেওয়া নোটবই-এর আকারে ভি. ডি. ও ওয়াকম্যান খুব শীঘ্রই বিশ্বের বাজারে ছাড়া হচ্ছে। খুব বেশী দেরী নয় ; ১৯৮৮ সালের শেষের দিকে এই জিনিষ বাজারে আসছে। এর মধ্যে থাকছে ভি. ডি. ও রেকর্ডার আর টেলিভিশন। তিন ইঞ্চি চওড়া তরল ক্রিষ্টাল পর্দায় এতে আট মিলিমিটার ভি. ডি. ও ক্যাসেটের টেপ থেকে পরিষ্কার ছবি ফুটে উঠবে। জাপানের একটি সংস্থা এটি তৈরী করেছে। ১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসে এটি জাপানের বাজারে ছাড়া হবে বিক্রীর জন্য। জাপানেই এর বাজার সীমাবদ্ধ থাকবে না। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে এই ভি. ডি. ও ওয়্যাকম্যান ছাড়া হবে। দাম অবশ্য এখন একটু বেশীই পড়বে। আমাদের হিসাবে দাম হবে প্রায় সাড়ে ১২ হাজার টাকা। এবছরের জুন মাসের গোড়ার দিকে টোকিওতে এই ভি. ডি. ও ওয়াকম্যান পরীক্ষামূলকভাবে অনেককে চালিয়ে দেখানো হয়েছে। লোকে পথ চলতে চলতেই এটি সঙ্গে নিয়ে বের হতে পারবেন। হাল্কা ও সর্বদা বহনযোগ্য এই ভি. ডি. ও ওয়াকম্যান হয়ত কিছু

দিনের মধ্যে আমরা পৃথিবীর অনেক দেশে অনেকের হাতে ঘোরা-ফেরা করতে দেখবো।

হেলি বিমান ঃ

নামটা শুনে অনেকে হয়ত বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা কি। বিমান ও হেলিকপ্টারের মধ্যে নিশ্চয়ই তফাৎ আছে। বিমান অনেক বড় হেলিকপ্টার ছোট। আবার বিমান অবতরণের জন্য প্রয়োজন বিমান বন্দরের কিন্তু হেলিকপ্টারের জন্য বিমান বন্দরের প্রয়োজন নেই। এটা যে কোনো একটু ফাঁকা জায়গাতে নামতে পারে। বিমানকেই হেলিকপ্টার হিসাবে ব্যবহার করার কথা হয়ত অনেকের কাছে কেমন বিশদৃশ বলে মনে হবে। ইউরোপে বিমান সংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়াররা কিন্তু এমন একটা নতুন ধরনের বিমান তৈরী করেছেন যা ইচ্ছামত হেলিকপ্টার হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। এর নাম দেওয়া হয়েছে ইউরোফার। পুরো কথাটা হল ইউরোপীয়ান ফিউচার অ্যাডভান্সড্ রোটায়ক্র্যাফট। এই বিমানে একসঙ্গে ১৯ জন যাত্রী নিয়ে যাওয়া যাবে। এর গতিবেগ হল ঘণ্টায় ৫৮০ কিলোমিটার এর ওজন মাত্র ১২ টন। বিমানবন্দর ছাড়াই এক শহর থেকে আর এক শহরে যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করতে পারবে। হয়ত অনেকে ভাবছেন তাহলে এর জ্বালানী খরচ নিশ্চয়ই বেশী। মোটেই নয়, এর জ্বালানী খরচ বিমান কেন হেলিকপ্টারের চেয়ে কম। সাধারণ হেলিকপ্টারের অর্ধেক জ্বালানী খরচেই এটি পাড়ি দিতে পারে অনেকটা পথ। বিমানটা যখন আকাশে উড়বে তখন এটিকে হেলিকপ্টার হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। হেলি-কপ্টার হিসাবে এটিকে ব্যবহার করা যাবে শুধুমাত্র ছাড়বার সময় ও মাটিতে নামবার সময়। তবে এখনো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এই বিমান চলাচলের ব্যবস্থা হয়নি। এখন এনিয়ে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলছে। তবে বিমান বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা আশা

করছেন যে, ১৯৯৭ সালের মধ্যে তাঁরা এই বিমানকে ব্যাপকভাবে ব্যবহারোপযোগী করে তুলতে পারবেন। বিমান অথচ হেলিকপ্টার সুতরাং আমরা এর নাম দিতে পারি হেলি বিমান।

নামী লোকের দামী চিঠি :

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী এ্যালবার্ট আইনস্টাইন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ফাঙ্কলিন রুজভেল্টকে আণবিক বোমা তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার আবেদন জানিয়ে ১৯৩৯ সালের ১১ অক্টোবর একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। তার একটি অনুলিপি নিউ ইয়র্কের এক নিলাম বাজারে ২ লক্ষ ২০ হাজার ডলারে বিক্রি হয়েছে। নিলামে চিঠি বিক্রির ব্যাপারে এটা একটা রেকর্ড। ক্রেতা একজন পুস্তক প্রকাশক। নাম ম্যালকম ফরবেস। ১৯৮৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর নিলামে তিনি ঐ চিঠি কিনে নিয়েছেন। নিলাম বাজারের কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন ওটা ৪০ হাজার থেকে ৬০ হাজার ডলারে বিক্রি হবে। কিন্তু পাওয়া গেল তার থেকে অনেক গুণ বেশী। নিউ-ইয়র্ক থেকে একটি খবরে জানা গেছে যে, ১৯৩৯ সালে লিও শিলার্ড নামে এক ভদ্রলোক আণবিক কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে রাজি করানর ব্যাপারে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সাহায্য চেয়েছিলেন। শিলার্ড ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের দুটি চিঠি লিখেছিলেন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন দুটি চিঠিতেই নিজের নাম সই করে তা প্রেসি-ডেণ্ট রুজভল্টের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ঐ বছর ১১ অক্টোবর তিনি যে চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন, সেটি ছিল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট শেষ পর্যন্ত আইনস্টাইনের আবেদনে সাড়া দিয়ে একটা কমিটি গঠন করেছিলেন। তারই ফলে গড়ে ওঠে ম্যানহাটন প্রকল্প। যে চিঠিটার অনুলিপি নিলাম বাজারে বিক্রির জন্য পাঠান হয়েছিল, সেটি এখন হাইড পার্কে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট লাইব্রেরিতে রয়েছে।

ঐতিহাসিক আবিষ্কার :

ইতিহাস পড়তে গিয়ে একঘেয়েমিতে যাদের মাথা ধরে যায়, তাদের জন্যে একটা ভাল খবর। রাজস্থানের উদয়পুরের ৪৪ কিলোমিটার দক্ষিণে একটি পরিত্যক্ত গ্রামে মাটির তলায় একটা মাটির পাত্র পাওয়া গেছে। সেই পাত্রে ছিল ২৯টি রৌপ্য মুদ্রা। এই মুদ্রার একপিঠে আরবি ভাষায় লেখা রয়েছে—আল্লা হো আকবর, আর উল্টোপিঠে খোদিত রয়েছে আমেদাবাদ টাঁকশালের নাম। সাল লেখা রয়েছে ৩৯ ইলাহি বছর। আমাদের আজকের হিসেবে ১ হাজার ৯৩ সাল।

ইতিহাসের কথা যখন উঠলই, তখন আরো একটি কথা বলে নিই। সম্প্রতি বৃটেনে দুটি ছবি পাওয়া গেছে। এই ছবিদুটিতে ফতেপুর সিক্রি কে তৈরি করেছিলেন তার একটা ইঙ্গিত মেলে। বলা হয়ে থাকে যে, তৃতীয় মোঘল সম্রাট আকবর ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দ নাগাদ এই শহরটি তৈরি করেছিলেন। কিন্তু লণ্ডনে ভিক্টোরিয়া এবং আলবার্ট মিউজিয়ামে ষোড়শ শতকের যে ছবি পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে আকবরের পিতা সম্রাট হুমায়ুন ঐ ফতেপুর শহরে এসে পৌঁছেছেন। এ থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, আকবর ফতেপুর সিক্রি তৈরি করেননি। তিনি এটি পেয়েছিলেন তাঁর পিতা হুমায়ুনের কাছ থেকে।

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের তারিখ ?

মহাভারতে বর্ণিত কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধের কথা আপনাদের সকলেরই জানা। এখন যদি প্রশ্ন করি, এই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধটা কবে শুরু হয়েছিল বলুন তো ? অনেকেই এ প্রশ্নে হয়তো ঘাবড়ে যাবেন, আবার অনেকে যা হোক একটা কিছু দিন ও সালের কথা বলে দেবেন। কিন্তু না, এর সঠিক তারিখ এখন নাকি জানতে পারা গেছে। পুনের বিজ্ঞানী ও সংস্কৃত পণ্ডিত ডঃ পি বি ভার্গব

অন্তত এই দাবিই করেছেন। তিনি বলেছেন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে মহাভারতে যেসব তথ্য আছে, তা বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে, কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল খৃস্টপূর্ব ৫ হাজার ৫৬২ অব্দের ১৬ অক্টোবর তারিখে। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, সূর্য-গ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতি সম্পর্কে মহাভারতে যে সমস্ত বর্ণনা রয়েছে তা থেকে গণনা করে এই তথ্য জানাতে পারা গেছে বলে ডঃ ভার্গব দাবি করেছেন। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধই শুধু নয়, এইভাবে গণনার মাধ্যমে তিনি মহাভারতে বর্ণিত ষাট-সত্তরটির মত ঘটনার সঠিক তারিখ বলে দিতে পেরেছেন। গত ১৮ বছর ধরে এসব ব্যাপার নিয়ে রীতিমত গবেষণা করে তবেই তিনি এই তথ্য জানিয়েছে।

কলকাতার বস্তি, হাওড়ার সেতু :

সারা ভারতে এখন বস্তিবাসীর সংখ্যা কত জানেন কি ? শহরের এদিকে ওদিকে যে অসংখ্য বস্তি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, তার কথা কারো অজানা নয়। কিন্তু আমরা কেউই জানি না, ভারতে বস্তিবাসীর মোট সংখ্যা কত। শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, আমাদের এই ভারতের কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লি আর মাদ্রাজে বস্তিতে বাস করেন ৯০ লক্ষ ২২ হাজার বাসিন্দা। ভারতের কোন শহরে সবচেয়ে বেশি বস্তিবাসী রয়েছেন, তা শুনলেও হয়তো কিছুটা অবাক হতে হবে। এক্ষেত্রে কলকাতা সবার শীর্ষে রয়েছে। এখানে বস্তিবাসীর সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে ৩০ লক্ষ ২৮ হাজারের মত। তথ্যটা আমার নয়। ১৯৮৭ সালের ৯ মার্চ লোকসভায় কেন্দ্রীয় নগর উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দলবীর সিং স্বয়ং এই তথ্য জানিয়েছেন। বস্তিবাসীর সংখ্যার দিক দিয়ে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে বোম্বাই। সেখানে এই সংখ্যা ২৮ লক্ষ ৩১ হাজার। দিল্লী ১৮ লক্ষ বস্তিবাসী নিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে আছে। এ ব্যাপারে চতুর্থ স্থানের অধিকারী মাদ্রাজ। সেখানে রয়েছেন মোট

১৩ লক্ষ ৬৩ হাজার বস্তিবাসী ! দেশের এই চারটি শহরে নথিভুক্ত আছেন এই সংখ্যক বস্তিবাসী। এর বাইরে হয়তো অনেক বস্তিবাসী আছেন। এ থেকে আমাদের বস্তির অবস্থাটা একবার বুঝে নিন।

বস্তিবাসী সংখ্যার দিক থেকে কলকাতা যেমন সবাইকে টেক্কা দিয়েছে, তেমনি আবার 'ব্যস্ততম সেতুর দিক থেকে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে হাওড়া ব্রিজ বা রবীন্দ্রসেতু! পৃথিবীর এখন সবচেয়ে ব্যস্ত সেতু বলতে রবীন্দ্র সেতু। এই সেতুর ওপর দিয়ে দৈনিক ৬০ হাজারের বেশি যানবাহন চলাচল করে। এছাড়া এই সেতু দিয়ে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করেন দৈনিক অসংখ্য যাত্রী। এত বেশি যানবাহন ও পদযাত্রী পৃথিবীর আর কোনো সেতু দিয়ে চলাচল করে না। দেড় হাজার ফুট লম্বা আর ৭২ ফুট চওড়া এই ঝুলন্ত সেতুটি বিদেশিদের কাছে একটা দর্শনীয় বস্তু।

চুল দেখে অপরাধী নির্ণয় :

মানুষের আঙুলের ছাপ দেখে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা পুলিশকে অপরাধী ধরতে সাহায্য করেন। প্রত্যেক মানুষের আঙুলের ছাপের মধ্যে তারতম্য থাকে। আর এই তারতম্য অপরাধী ধরতে পুলিশকে সাহায্য করে। অনেক সময় আবার দাগী অপরাধীদের হাতের ছাপ পুলিশ সংশ্লিষ্ট থানায় রেখে দেয়। খুব শীঘ্র হয়তো আঙুলের মত চুলও অপরাধী সনাক্ত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠবে। প্রজনন বিদ্যা বিশেষজ্ঞদের মতে প্রত্যেক মানুষের চুলের মধ্যে পার্থক্য আছে। একজনের চুল অন্য জনের চেয়ে আলাদা। জীব বিজ্ঞানের অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও ইলেক্ট্রা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। মাদ্রাজের কাছে তারামণিতে যে মৌলিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত স্নাতকোত্তর সংস্থা আছে তার বিশেষজ্ঞরা সম্প্রতি এই তথ্য জানিয়েছেন। সেখানকার অধ্যাপক মারিমুথু জানিয়েছেন যে, মানুষের চুলের গোড়া পরীক্ষা করে

বলে দেওয়া যায় যে ঐ চুল পুরুষের না মহিলার। সুতরাং এই তথ্য আমাদের অপরাধী নির্ণয়ে পুলিশকে খুবই সাহায্য করতে পারে।

স্কুল বিতাড়িত কৃতী ছাত্র :

পরীক্ষায় একের পর এক ফেল করার জন্য চীনের সাংহাইতে একটা ছেলেকে বিদ্যালয় থেকে শেষ পর্যন্ত তাড়িয়ে দেওয়া হল। কিন্তু ছেলেটার মধ্যে যে এত প্রতিভা লুকিয়ে ছিল তা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানবেন কি করে? ফেল করা ছেলে, সুতরাং কোথাও তার ঠাঁই নেই, বাড়িতেও অভিভাবকদের কাছ থেকে তাকে নানা গঞ্জনা সহ্য করতে হত অথচ শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ১৬ বছরের স্কুল তাড়ানো ছেলেটাই পেল একটা আন্তর্জাতিক পুরস্কার। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু সংস্কার উপায় বাৎলে দিয়ে মাও জিয়ালিং নামে ঐ ছেলেটা পেয়ে গেল আন্তর্জাতিক পুরস্কার। ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে তাকে বিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। অথচ আশ্চর্যে ব্যাপার যে আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাবার পর তার কদর রীতিমত বেড়ে গেল। সব স্কুলই তাকে ছাত্র হিসাবে ভর্তি করে নিতে চায়। শেষকালে জিয়াজনিং হাইস্কুলে আবার তাকে ভর্তি করে নেওয়া হল। তারই সংস্কার-মূলক শিক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী তাকে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হল। সত্যি অদৃষ্টের কি পরিহাস!

জেল পালানো নায়ক :

কয়েদীদের জেল পালানোর অনেক লোমহর্ষক কাহিনীর কথা শোনা গেছে। জেল থেকে পালানোর জন্য কত রকমের ছল-চাতুরীর আশ্রয় না তারা গ্রহণ করে থাকে। সম্প্রতি এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লুসিয়ানার জেল থেকে পালিয়ে গিয়ে এক বন্দী

বোধ হয় কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। আঠারো বছর বয়স্ক ঐ বন্দীটাকে তার সেলে যে গর্তটা দিয়ে খাবার দেওয়া হত, সেটার মধ্য দিয়েই পালিয়েছে। আর গর্তটা ছোট বলে তা দিয়ে মাথা গলিয়ে পালাবার জন্য সে নিজের মাথা কামিয়েছে, গা থেকে জামা-কাপড় খুলে ফেলে সারা শরীরে তেল লোশন মেখে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় সে কোনোরকমে ঐ গর্ত দিয়ে গলে চার তলায় জানলায় একটা এয়ার কণ্ডিশনারকে সরায়। সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে তিন তলায় আর একটা এয়ারকণ্ডিশনার মেশিনের ওপর। তারপর সোজা লাফিয়ে পড়ে একতলার মাটিতে। ব্যাস, সেখান থেকে তার জেল পালানো সফল। সত্যি দুঃসাহসিক অভিযান বটে।

ছারপোকা মারার কৌশল :

বাড়িতে ছারপোকার উপদ্রবে যাঁরা অতিষ্ঠ, তাঁদের জন্য একটা সুখবর আছে। আগেই বলে রাখছি, খবরটা কিন্তু আপনি অন্য কাউকে জানাবেন না। একেবারে গোপন রাখবেন। বিজ্ঞানীরা ছারপোকার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁরা এমন ধরনের এক কীটনাশক উদ্ভাবন করেছেন, যা সূর্যের রশ্মিকে মারণ-রশ্মিতে পরিণত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এই কীটনাশক উদ্ভাবন করেছেন। এতে থাকে সাধারণ অ্যামিনো অ্যাসিড যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পক্ষে ক্ষতিকর নয় বলে তাঁদের আশা। তবে এতে বাড়ির মাছি, আরশোলা থেকে আরম্ভ করে কৃষিজ পোকামাকড় মারা যায়।

সারা পৃথিবীতে বহু বছর ধরে বাগানে ও খামারে নানান ধরনের বিষাক্ত কীটনাশক স্প্রে করা হচ্ছে। এইসব বিষাক্ত কীটনাশক ভূগর্ভস্থ জল সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে মিশে গিয়ে ক্যান্সার ও অন্যান্য ক্ষতিকর রোগের বিস্তার ঘটাচ্ছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যবহার করে যে কীটনাশক উদ্ভাবন করেছেন

তা জৈব রসায়নের সৃষ্টি করে কীটপতঙ্গের কোষে। আর সেই কীটপতঙ্গ সূর্যালোকের সংস্পর্শে যখন আসবে তখন অতিরিক্ত জৈব রসায়নে তখনই ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। ছারপোকা ও অন্যান্য পতঙ্গের কোষ এতে নষ্ট হয়ে যাবে। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তাদের মৃত্যু ঘটবে। চিকাগো থেকে পাওয়া এক খবরে এটা জানা গেছে।

পিরামিডের তলায় পুরানো বাতাস :

মিশরের পিরামিডের কথা ছোটবেলা থেকে আমাদের মনে রূপকথার মত গেঁথে আছে। এই পিরামিডের তলায় গহ্বরে বহু প্রাচীন কালের বাতাস থাকতে পারে এবং তা আমাদের সেই সময়কার পৃথিবীর পরিবেশ জানতে সাহায্য করতে পারে একথা আমাদের কারো কোনোদিন মনে হয়নি। কিন্তু আমাদের মনে না হলে কি হবে বিজ্ঞানীদের মনে হয়েছে। তাইতো মিশরীয় ও মার্কিন বিজ্ঞানীদের একটা দল মহাকাশ প্রযুক্তির সাহায্যে চিয়পস্ পিরামিডের তলায় একটা গহ্বর থেকে সংগ্রহ করেছেন সাড়ে চার হাজার বছরের বেশী পুরানো বাতাস। বিজ্ঞানীরা এখন ঐ বাতাস বিশ্লেষণ করে দেখছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশানাল অ্যারোনটিক্স এ্যাণ্ড স্পেস এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের বিজ্ঞানীরা এব্যপারে বেশ কিছু এগিয়েছেন। তাঁরা ঐ বাতাসকে বিশেষ ভাবে তৈরী বোতলে পুরে রেখেছেন। তাছাড়া পিরামিডের তলায় ঐ গহ্বরের মধ্যে বিশেষ ক্যামেরা ঢুকিয়ে ছবি নেবার চেষ্টা হচ্ছে, আর চেষ্টা হচ্ছে কিছু সাজ-সরঞ্জাম ঢুকিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। বিজ্ঞানীদের ধারনা ঐ বাতাস বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁরা সুপ্রাচীন কালে পৃথিবীর পরিবেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন। আর জানতে পারবেন কেমন করে সুপ্রাচীনকালে মিশরের মানুষরা হাজার হাজার বছর ধরে তাদের জিনিষপত্র সংরক্ষণ করতেন। মিশরের প্রত্নতাত্ত্বিক কাজে এই প্রথম মহাকাশযুগের প্রবেশ ঘটলো।

পোলিওর আবিষ্কারক ঃ

এবার ডাঃ আলবার্ট সাবিনের জীবনের এক মর্মান্তিক অধ্যায়ের কথা শুনুন। আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে পোলিও রোগের প্রতিষেধক হিসাবে শিশুদের যে ওষুধ খাওয়ানো হয়ে থাকে পঞ্চাশ বছর আগে ডাঃ সাবিন সেই ঔষধ আবিষ্কার করেন। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে তিনিই আজ পোলিও রোগে আক্রান্ত। চলার ক্ষমতা হারিয়ে তিনি বিছানায় পড়ে আছেন। শরীরের ওপর এবং নিচের অংশে পক্ষাঘাতে তাঁর স্নায়ুকোষগুলি অকেজো হয়ে পড়েছে।

তেজস্ক্রিয়ের মোকাবিলা ঃ

অস্ট্রেলিয়ার একজন অধিবাসী পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা মোকাবিলা করার একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে এটা রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করবে। সামরিক এবং অসামরিক লোকেরা সবাই এই আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবেন। নিউট্রন এবং গামা তেজস্ক্রিয়ের বিরুদ্ধে রক্ষণাত্মক এই পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শতকরা ৯৮ ভাগ ক্ষেত্রে এটা সফল হয়েছে। পারমাণবিক বর্জ্য পদার্থের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এই পদ্ধতি বেশ ভাল কাজ দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পারমাণবিক শীত ঃ

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একদল বিজ্ঞানী বলেছেন যে, বর্তমানে পৃথিবীতে সঞ্চিত সাড়ে তের হাজার মেগাটন পরামাণবিক বোমার মধ্যে যদি এক হাজার মেগাটন পারমাণবিক বোমা ফাটানো হয় তবে সারা বিশ্বে পারমাণবিক শীত নেমে আসবে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরাও আছেন। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে এক সম্মেলনে ঐ বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, হাজার মেগাটন পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীতে অনেক জীবনের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

মহাকাশ সম্পর্কে

হ্যালির ধূমকেতু ঃ

হ্যালির ধূমকেতু সম্পর্কে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা ব্যাবিলোনিয় মাটির ফলক থেকে নতুন তথ্য জানা গেছে। এই মাটির ফলকে উল্লেখ করা আছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব ১৬৪ সালে আকাশে এই ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছিল। ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীদের ব্যাপক অনুসন্ধানমূলক কাজের ফলেই এই আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ইংলণ্ডের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ রিচার্ড স্টিফেনসন বলেছেন যে, হ্যালির ধূমকেতুর বিশেষত্ব হচ্ছে যে, আমাদের জানা এই একমাত্র ধূমকেতুই প্রতিবারেই আরো উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞানী বলেছেন যে, কোটি কোটি বছর আগে ধূমকেতুর উল্কাপিণ্ড ও অন্যান্য গ্রহের অংশবিশেষ ছিটকে গিয়ে পৃথিবীর মাটিতে আঘাত করার ফলেই হয়ত প্রাকৃতিক গ্যাসের সৃষ্টি হয়েছে—উদ্ভিদের ও প্রাণীর রূপান্তর ঘটেছে। ডঃ টমাস গেল্ডি-এর মতে এই তত্ব সঠিক হলে উল্লেখযোগ্য ভাবে নতুন আবিষ্কার থেকে পৃথিবীর জ্বালানী সরবরাহের পরিমাণ অনেকটা বেড়ে যায়। এতে ভূতাত্ত্বিক দিক দিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের বণ্টনের ব্যাপারেও জানতে সুবিধা হবে।

ছায়াপথে গহ্বর ঃ

সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা ছায়াপথের মাঝখানে এক বিরাট কালো গর্তের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য ব্যাপক গবেষণা চালাচ্ছেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞানী এখন

জানিয়েছেন যে, তাঁরা ছায়াপথে ঐ বিরাট কালো গহ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নতুন তথ্যপ্রমাণ পেয়েছেন। এই নতুন তথ্য সাম্প্রতিক কালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আলোকরশ্মির রহস্য ঘিরে বিতর্কের অবসান ঘটাতে সাহায্য করবে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, এই কালো গহ্বরের বিস্তৃতি ৯৬ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার। এই কালো গহ্বর মৃত নক্ষত্রের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। আর এর ঘনত্ব এত বেশী, যে, হাল্কা রশ্মি পর্যন্ত এর অভিকর্ষ থেকে রেহাই পায় না। এটা সেই কারণে দেখা যায় না। এর চারপাশের বস্তুর ওপর এর প্রতিক্রিয়া থেকেই কেবল মাত্র এর অস্তিত্ব জানা যায়। বিজ্ঞানীরা ঘণ্টায় ৬ লক্ষ ৯২ হাজার বেগে হাল্কা ঘনত্বের প্রচুর গ্যাস এর মধ্যে প্রবেশ করতে দেখেছেন বলে জানানো হয়েছে। দশ আলোকবর্ষ লম্বা এই গহ্বরের মধ্যে একগুচ্ছ নক্ষত্র রয়েছে।

নতুন তারকা ও ছায়াপথের সন্ধান :

মহাকাশে পরিক্রমারত একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কুড়ি হাজার নতুন তারকা এবং কুড়ি হাজার নতুন ছায়াপথ আবিষ্কৃত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি মহাকাশযানে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি মহাকাশে পাঠিয়েছে। মহাকাশ সম্পর্কে গবেষণার কাজে সহায়তা করছে ঐ দূরবীক্ষণ। ইনফ্রারেড আলোর সাহায্যে আকাশে তন্নতন্ন করে অনুসন্ধানের কাজ চালাচ্ছে সে। বিজ্ঞানীরা এর সাহায্যে সৌরজগতে ৫টি ধূমকেতু ও জমাট বলয়ের সন্ধান পেয়েছেন।

দুটি সূর্য :

চীনের সানদং প্রদেশের বন্দর শহর কুইংডাও-এর কাছে পর্যটন কেন্দ্র মাউন্ট লাওশানতে গত ১৪ ডিসেম্বর সোমবার সমুদ্রের ওপরে পাশাপাশি দুটি সূর্যকে দেখা গেছে। দুটি সূর্যই আকারে একই রকমের এবং পরস্পর থেকে প্রায় ১০ মিটার দূরে। ডানদিকের

সূর্যটা ধীরে ধীরে আবছা হয়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই ঘটনা ঘটে ৫ মিনিট ধরে। প্রত্যক্ষদর্শীরা একথা জানিয়েছেন।

চীনের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, দক্ষিণ মেরুতে ইতিপূর্বে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তবে সমুদ্রে বাতাসের অসম ঘনত্ব ও প্রতিফলনের অস্বাভাবিকতা এর কারণ হতে পারে বলে তাঁদের ধারণা।

সূর্যের তেজ :

সৌরশক্তিকে মানুষ নানান কাজে লাগাবার কথা এখন চিন্তা করছে। সৌরশক্তির সাহায্যে এখন রান্নাবান্নার কাজ চলছে, টেলিভিশান চালানো হচ্ছে, এমন কথাও আমরা জানি। আমরা অনেকেই জানি না যে, পৃথিবীতে মানুষ সমস্ত সূত্র থেকে যে পরিমাণ জ্বালানী পেয়ে থাকে, তার কুড়ি হাজার গুণ বেশী জ্বালানী শক্তি পাওয়া যায় সূর্য থেকে। সূর্য থেকে যে তাপ পাওয়া যায় তাকে যদি ঠিকমতো কাজে লাগানো যায় তবে আমাদের দেশের গ্রামগুলি জ্বালানী শক্তির ব্যাপারে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। অন্ততঃ বিজ্ঞানীরা একথা জানিয়েছেন। এর আর একটা কারণ হল—ভৌগলিক দিক দিয়ে ভারতের যে অবস্থান তাতে আমরা সৌরশক্তি সবচেয়ে বেশী পরিমাণ সুবিধা পেতে পারি। শহরের শিল্প কেন্দ্রগুলি থেকে গ্রাম অনেক দূরে হলেও এই সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে গ্রামগুলিতে শিল্প কারখানা গড়ে তোলা যেতে পারে। গ্রামে যে ধান, পাট, যব, ছোলা, মটর, গম উৎপাদন হয় তা কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে রোদে শুকিয়ে নেবার ব্যবস্থায় প্রচলন রয়েছে। সুতরাং সৌরশক্তিকে আমরা বরাবরই কাজে লাগাচ্ছি। বর্তমানে আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের সুফলকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে এই সৌরশক্তিকে আমরা আরো অনেক কাজে লাগাতে পারি। এ থেকে আরো বেশী তাপশক্তি পাওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা এখন রীতিমত এনিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করে দিয়েছেন।

সূর্য গ্রহণ সম্পর্কে মজার ঘটনা ঃ

১৯৮০ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী শনিবারের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ছিল এই শতকের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক ঘটনা। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শত শত বিজ্ঞানী সহ লক্ষ লক্ষ মানুষ এই প্রথম চাঁদের বিরাট আকৃতির ছায়া কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও উড়িষার ওপর দিয়ে ধেয়ে চলে যেতে দেখলেন। শত শত বৎসর ধরে বহু বিজ্ঞানী পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবার জন্য এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখতে কখনো বা মরুভূমিতে কখনো নির্জন পরিত্যক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখবার জন্য নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করেছেন। কিন্তু ফরাসী জ্যোর্তিবিজ্ঞানী মিষ্টার জানসেনের অভিজ্ঞতার বুঝি কোনো তুলনা নেই। সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার সমন্বয় সাধনকারী ডঃ জে, সি, ভট্টাচার্য জানিয়েছেন যে ১৮৭০ সালে সূর্যগ্রহণের সময় মিঃ জানসেন ছিলেন অবরুদ্ধ নগরী প্যারীতে। সড়ক পথে ওই শহর থেকে বেরিয়ে আলজিরিয়ায় সূর্যগ্রহণ দেখতে যাওয়ার কোনো উপায়ই ছিল না। মিঃ জানসেন তখন একটি গণ্ডোলাতে চেপে তাতে একটি বেলুন লাগিয়ে শত্রুদের মাথা টপকে সেখানে পৌঁছে যান। এই সূর্যগ্রহণের দরুণ চীনের রাজসভার দুজন জ্যোর্তি-বিজ্ঞানীকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। যীশুখৃষ্টের জন্মের ২১৩৭ বছর আগে এক ২২শে অক্টোবর যে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল ঐ জ্যোর্তি-বিজ্ঞানীদ্বয় তার পূর্বাভাষ দিতে না পারায়, চীন সম্রাটের নির্দেশে ওদের গলা কাটা গিয়েছিল। সে যুগে এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ছিল বিরল ঘটনা। বিজ্ঞানীরা নার্ভাস হয়ে পড়তেন। একেবারে চরম মূহূর্তে হয় দূরবীনের ঢাকনা খুলতে ভুলে যেতেন, নয় ক্যামেরার ফিল্ম লাগাতে ভুলে যেতেন। এমনি এক কারণে ওই চীনা জ্যোর্তিবিজ্ঞানীদ্বয়ের প্রাণদণ্ড হয়েছিল।

এই সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে মধ্যপ্রদেশের ক্ষয়িষ্ণু ভাতার উপজাতিদের মধ্যে একটা কাহিনী প্রচলিত আছে। এই কাহিনীর একটা শিক্ষার

দিক আছে। তাতে বলা হয়েছে যে কেউ যদি ঋণ নেয় তবে তিনি মারা গেলেও ভবিষ্যৎ বংশধরদের তা শোধ করতে হবে। একবার একজন ঝাড়ুদার একটা গ্রামের রাস্তায় ঝাড়ু দিচ্ছিল। এই ঝাঁট দেবার সময় সে কয়েক দানা শষ্য স্বর্গে ফেলে দিয়েছিল। সে শষ্যগুলো তারা হয়ে গেল। সূর্য ও চাঁদ ঐ ব্যাপার দেখে ওই ঝাড়ুদারের কাছে কয়েকদানা শষ্য চাইল। ঝাড়ুদার বলল তা দেবার উপায় নেই। তখন তারা বলল যে ঠিক আছে ঋণ হিসাবেই কয়েক দানা শষ্য দাও। সূর্য এবং চাঁদ সেই ঋণ শোধ দিতে পারেনি। তারপর থেকে ঐ ঝাড়ুদারকে দেখলে চাঁদ ও সূর্য একে অপরের আড়ালে লুকোতে চেষ্টা করে। সেই থেকেই গ্রহণের সুরু।

একশো বছরের মধ্যে এই প্রথম তিরুমালা পাহাড়ের ওপর ভেঙ্কটেশ্বরের যে মন্দির রয়েছে তা ঐ গ্রহণের দিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বন্ধ ছিল। দু হাজার তিনশো বছর ধরে এই মন্দিরে প্রত্যেক দিন পূজো হয়ে থাকে।

সূর্যগ্রহণের দিকে খালি চোখে তাকাতে নেই—এই সাবধান বাণী সত্ত্বেও বহু মানুষ খালি চোখে এই গ্রহণ দেখে চোখের ক্ষতি করেছেন। কেরালার আলেপ্পী জেলার ৪২ বছর বয়সী জনার্দন বাজি ধরেছিল যে সে খালি চোখে গ্রহণের সময় সূর্যের দিকে তাকাবে। বাজি সে জিতেছে কিন্তু সে চোখে একদম দেখতে পাচ্ছে না।

মহাকাশে মানুষের দেহাবশেষ ঃ

বিজ্ঞানের কল্যাণে এখন মানুষ মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে। মহাকাশের নতুন নতুন রহস্য উদ্ঘাটন করছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশকে কাজে লাগিয়ে তারকা যুদ্ধের পরিকল্পনাও করেছে। এতো গেল জীবিত মানুষের কথা। কিন্তু মরা মানুষকে মহাকাশে পাঠানোর পরিকল্পনার কথা শুনলে অনেকে আঁৎকে

উঠবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চ্যালেঞ্জার মহাকাশ যানে দুর্ঘটনার পর তাঁরা আপাতত মহাকাশ যাত্রা স্থগিত রেখেছেন। কিন্তু তাঁদের পরবর্তী পরিকল্পনার কথা শুনে অনেকে অবাক হবেন। পরিকল্পনাটি হল—এবার তাঁরা হাজার হাজার মানুষের দেহাবশেষ পাঠাবেন অন্তরীক্ষে। ১৯৮৭ সালের শেষ ভাগে, দেহাবশেষ বোঝাই লিপস্টিকের আকারে ১০ হাজার ক্যাপসুল, কনেস্টরা ২ রকেটের সাহায্যে মহাকাশে পাঠানো হবে। সে দেশের স্পেস সার্ভিসেস কোম্পানি এ ব্যাপারে নাসার (NASA) সঙ্গে এক চুক্তি করেছে। কিন্তু আমেরিকাবাসী হঠাৎ কেন তাঁদের প্রিয়জনদের দেহাবশেষ ওভাবে ভূপৃষ্ঠ থেকে ২৪০০ কিলোমিটার দূরে মহাকাশে পাঠাতে উদ্যোগী হলেন? তবে কি ঐ দেহাবশেষ স্বর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে? তারা কি 'স্বর্গের' ঠিকানা পেয়ে গেছেন! না, এই পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত কারণ এখনও জানা যায়নি।

মহাকাশচারী ক্লাব ঃ

গরম পড়ার সাথে সাথে আমাদের সকলেরই প্রাণ আইঢাই হয়ে ওঠে। অসহ্য গরমে আমরা অনেক সময় জলে থাকতে ভালবাসি। গ্রীষ্মকালে তাই অনেকে সাঁতারের ক্লাবে ভর্তি হয়ে জলে সাঁতার শিখি। ক্লাবে খেলা ধূলোর জন্য অনেকে ভর্তি হই। সোভিয়েত ইউনিয়নে একটা মজার ক্লাবের খবর আমরা অনেকেই জানি না। ক্লাবটার নাম মহাকাশচারীদের ক্লাব। অবশ্য সকলেই, এর সদস্য হতে পারবে না। শুধু ছোটরাই এই ক্লাবে ভর্তি হতে পারে। এই ক্লাবে ছোটরা ভর্তি হবার ইচ্ছা করলেই কিন্তু ভর্তি হতে পারবে না। এই ক্লাবে ভর্তি হবার যোগ্যতা হল বিদ্যালয়ে পড়াশুনা ভাল করে পরীক্ষার ফল রীতিমত ভাল করতে হবে, খেলাধুলায় ভাল হতে হবে, আর তৈরী করতে শিখতে হবে বিমানের সহজ মডেল।

মহাকাশচারীদের ঐ ক্লাবটাতে গ্রীষ্মকালে সদস্যদের শেখানো হয় এয়ার গ্লাইডিং আর প্যারাস্যুটিং বা প্যারাসুটে করে আকাশ থেকে মাটিতে নামা। শরৎকালে তাদের শেখানো হয় বিমান আর মহা-কাশযানে চলাফেরা নানান তত্ত্ব। সোভিয়েট ইউনিয়নে এই ধরনের আরো একটা পুরানো ক্লাব আছে। সেটি গড়ে তোলা হয় ১৭৭৮ সালে। ঐ ক্লাবটার নাম ইয়েগোরেভস্ক। ক্লাবের সদস্যরা বেশ মজা করে মহাকাশচারী হিসাবে তালিম নেয়। সত্যি কি মজার ব্যাপার। ছোট বয়স থেকে এই তালিম পেয়ে অনেকে ভাল মহাকাশচারী হয়ে উঠবেন, এটাই সকলের আশা। আমাদের এখানে যদি এই ধরনের একটা ক্লাব গড়ে উঠতো তবে অনেক অভিভাবক হয়ত তাদের সন্তানদের ঐ ক্লাবে ভর্তি করতেন। যাক দুঃখ করবেন না। আপাততঃ সোভিয়েট ইউনিয়নের ছেলেরাই এই সুবিধা ভোগ করুক। পরে হয়ত আমাদের ছেলেমেয়েদের এই সুযোগ সুবিধা হবে।

বিচিত্র ঘটনা

সাঁপের জুস আর মাংস ঃ

সাপের মাংস বা সাপের জুস খাবার কথা শুনলে অনেকের হয়ত গা ঘিন ঘিন করে উঠবে। ভাববেন, এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অবিশ্বাস্য হলেও কিন্তু এটা একেবারেই সত্যি। দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রীড়াবিদরা প্রতিদিন হাজার হাজার সাপের মাংস আর সাপের জুস খেয়ে সিওল অলিম্পিকে পদকের জন্য লড়ে গেছেন। তাদের ধারণা এটা নাকি বলবর্দ্ধক টনিকের সব কাজ করে। এর চেয়ে ভাল শক্তি বর্দ্ধক টনিক আর নেই। দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রীড়াবিদদের দেখাদেখি অন্য কয়েকটি দেশের ক্রীড়াবিদরাও সিওল অলিম্পিকে গিয়ে এই উপাদের খাবার খেয়ে রসনা তৃপ্ত করেছেন আর শরীরে নাকি অসাধারণ বল ফিরে পেয়েছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার কুস্তিগীর হ্যান মিয়াং গুর্ একাই প্রতিদিন ১০০টা করে সাপ খেয়েছেন। এর মধ্যে কিছু সাপ কেটে মাংস রান্না করে খাওয়ানো হয়েছে আর কিছু সাপের জুস তৈরী হয়েছে। মেয়ে হকি খেলোয়াড় কিয়েং যুকের বক্তব্য সাপের মাংস আর সাপের জুস সবচেয়ে বেশী শক্তি জোগাতে একেবারে অদ্বিতীয়। তিনি প্রতিদিন এই খাবার খেয়ে গেছেন অন্যান্য খাবারের সঙ্গে। এটা নাকি একটা তোফা খাবার। আগে তার এই সাপের মাংস বা জুস খাওয়া অভ্যাস ছিল না। এবারই তিনি প্রথম এটা খেলেন। খেয়ে অবশ্য তিনি বমি করেননি বা তার গা গুলিয়ে ওঠেনি। বেশ মজা করেই খেয়েছেন, রসনা তৃপ্ত করেছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার ফুটবল খেলোয়াড়দের জন্য প্রতিদিন ৫০০ করে সাপ লেগেছে এই কদিনে।

এবার প্রথম নয়। আসলে সিওলে কয়েক বছর আগেই এই তথাকথিত উপাদেয় খাদ্যটি চালু হয়েছিল। সাপের মাংস আর জুস সে দেশের হোটেলগুলিতে দৈনিক খাদ্য তালিকায় রাখা হয়েছে। হোটেলগুলির এতে রমরমা ব্যবসাও চলছে।

অনেকে হয়ত জানতে চাইছেন এই সাপর জুস কি ভাবে তৈরী করতে হবে? পদ্ধতিটা বাৎলে দিচ্ছি, তবে ব্যাপারটা গোপন রাখবেন কিন্তু। হ্যাঁ সাপের পেটটা চিরে নাড়ি ভুড়ি বের করে ফেল্লুন। মুণ্ডুটাকেও কেটে বাদ দিন। এর পর সসপ্যানে কিছু জল দিয়ে তা উনুনে চাপিয়ে দিন। তাতে সাপ ফেলে দিন। ভালমত সেদ্ধ হয়ে গেলে তা নামিয়ে একটা লম্বা কাপড়ে মধ্যে জড়িয়ে এক জায়গায় করে চাপ দিন। তা থেকে টপ্ টপ্ করে বেরিয়ে পড়বে জুস। খেতে মুরগীর মাংসের মত। আর সাপের মাংস রাঁধবেন মুরগীর মাংসের মত।

মুখরোচক ইঁদুরের মাংস ঃ

চীনের গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে ইঁদুর। ফুজিয়ান প্রদেশে স্থানীয় লোকেদের কাছে ইঁদুর বিশেষ করে জনপ্রিয় হবার কারণ হল এর মুখরোচক স্বাদ। তাঁদের কাছে ইঁদুর হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে উপাদেয় খাদ্য। আর এই ইঁদুরের মাংস রান্না করার পদ্ধতিও খুব সোজা। কিছু ইঁদুরের মাংস নিন। সেদ্ধ করুন। তারপর আদা ও লঙ্কার সসে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখুন। এরপর গরম তিল তেল আর চালের তুষের মধ্যে ঐ মাংসটুকু ফোটান। চীনের দৈনিক সংবাদপত্রের মতে, সেদেশে ইঁদুরের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তাতে ইঁদুরের মাংস খাওয়াটা ইঁদুর নিয়ন্ত্রণের একটা উপায়। চীনে ইঁদুরের সংখ্যা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ বিলিয়ন। আর এই ইঁদুরেরা বছরে দেড় কোটি টন খাদ্যশস্য খেয়ে নষ্ট করে। ঐ সংবাদপত্রে জানানো হয়েছে যে, সেদেশের কয়েকটা অঞ্চলে ইঁদুরেরা বেপরোয়াভাবে মানুষকে পর্যন্ত আক্রমণ করছে।

আরশোলার বিরুদ্ধে সংগ্রাম :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত শক্তিশালী দেশে এখন সংগ্রাম চলছে। অবশ্য শত্রুরা এত চালাক বলে মনে হচ্ছে যে, তাদের নিধন করা অতটা সহজ নয়। শত্রু নিধনের জন্য সেখানে ফাঁদ পাতা হচ্ছে। রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু শত্রুপক্ষকে কিছুতেই ঘায়েল করা যাচ্ছে না। আর এই শত্রু কারা জানেন? আসলে শত্রুরা হল আরশোলা। এদের কিছুতেই নিশ্চিহ্ন করা যাচ্ছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে আরশোলার উপদ্রব খুব বেড়ে চলেছে। বাড়িতে, রান্না ঘরে সর্বত্রই আরশোলাদের উপদ্রবে সেখানকার লোকেরা রীতিমত অতিষ্ঠ। উঁচুদরের প্রযুক্তি আরশোলাদের খুব পছন্দ। তাই স্টিরিও সেট এবং কম্পিউটারের মধ্যে আরশোলারা আশ্রয় নেয়। ঐসব যন্ত্র থেকে যে তাপ বের হয় তা আরশোলাদের খুব পছন্দ। তাই সেখানে বাসা বাঁধতেই তারা বেশি ভালবাসে। এইসব আরশোলার মধ্যে যে জাতের আরশোলা নিয়ে বেশি আশঙ্কাএবং যাদের ব্যাপক বংশবৃদ্ধি ঘটে থাকে তাদের নাম জার্মান আরশোলা। আরশোলা নিধনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর খরচ হয় আনুমানিক এক বিলিয়ন ডলার। আর এই আরশোলা নিধনে যে অস্ত্রটা বেশি ব্যবহৃত হয় সেটার নাম 'রোচ মটেল'। একটা কার্ড বোর্ড বাক্সে ফাঁদ পেতে আরশোলাদের প্রলুব্ধ করা হয়। এই আরশোলাগুলোর মধ্যে কোনোটা ৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। বুঝুন কী বিরাট সাইজের আরশোলা! ঐ বাক্সে বিশেষভাবে তৈরি গন্ধযুক্ত সামগ্রী রাখা হয় যা আরশোলাদের খুবই পছন্দ। সেই গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে আরশোলাগুলো তাতে ঢুকলেই ফাঁদে আটকে মারা পড়ে। তবে নিউইয়র্কবাসীদের ধারণা, এই পদ্ধতির দ্বারা আরশোলাকুলকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা যাবে না। সুতরাং আরশোলাদের নিয়েই তাঁদের থাকতে হবে। অবশ্য তাই বলে একে মোটেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বলে মেনে নেওয়া যায় না।

নেকড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ :

বিহারের হাজারিবাগ জেলাতেই আর একরকম যুদ্ধ চলছে। আর এই যুদ্ধটাও কিন্তু সমানে সমানে নয়। সেখানে মানুষখেকো নেকড়েদের বিরুদ্ধে এখন অভিযান চলছে। বনবিভাগের চিফ কনজারভেটর জানিয়েছেন যে, নেকড়েরা গ্রামের ৭৯জন মানুষকে মেরে ফেলেছে এবং আরো ৬৫ জনকে আক্রমণ করে আহত করেছে। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সেখানে ৫ জনের একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। বন বিভাগ আকাশ পথে কড়া নজরদারির জন্য সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারের সাহায্য চাইবার কথা ভাবছেন। বনবিভাগের চিফ কনজারভেটর জানিয়েছেন যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারীদের সাহায্যও নেওয়া হবে। প্রতিটি মানুষখেকো নেকড়ের মাথার খুলির জন্য পাঁচ হাজার টাকা করে পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে।

কুকুর কামড়ানোয় ক্ষতিপূরণ :

হ্যাঁ বন্দরশহর ডারবানে বসবাসকারী একজন ভারতীয় মহিলার ছেলেকে পুলিশ কুকুরের কামড়ানোর ফাল ছেলেটা মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে। আর এর জন্য ঐ ভদ্রমহিলা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ বাবদ সেদেশের মুদ্রায় ৭৫ হাজার র‍্যাণ্ড দাবি করেছেন। গত অক্টোবর মাসে ডারবানে ঐ পুলিশ কুকুরটা ভারতীয় ঐ ভদ্রমহিলার ছেলেটির পেছনে ধাওয়া করে তার হাতে পায়ে, ঘাড়ে, পেটে এক কথায় সর্বত্র কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। কুকুরের কামড় খেয়ে ছেলেটিকে বেশ ক' সপ্তাহ হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হয়েছে। তার সর্বাঙ্গে দাগ হয়ে গেছে। আর এইসব কারণে তার মা শ্রীমতী ডি নাইডু ঐ অর্থ ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের একজন মুখপাত্র অবশ্য বলেছেন যে, তাঁদের অ্যাটর্নি এখন বিষয়টা খতিয়ে দেখছেন।